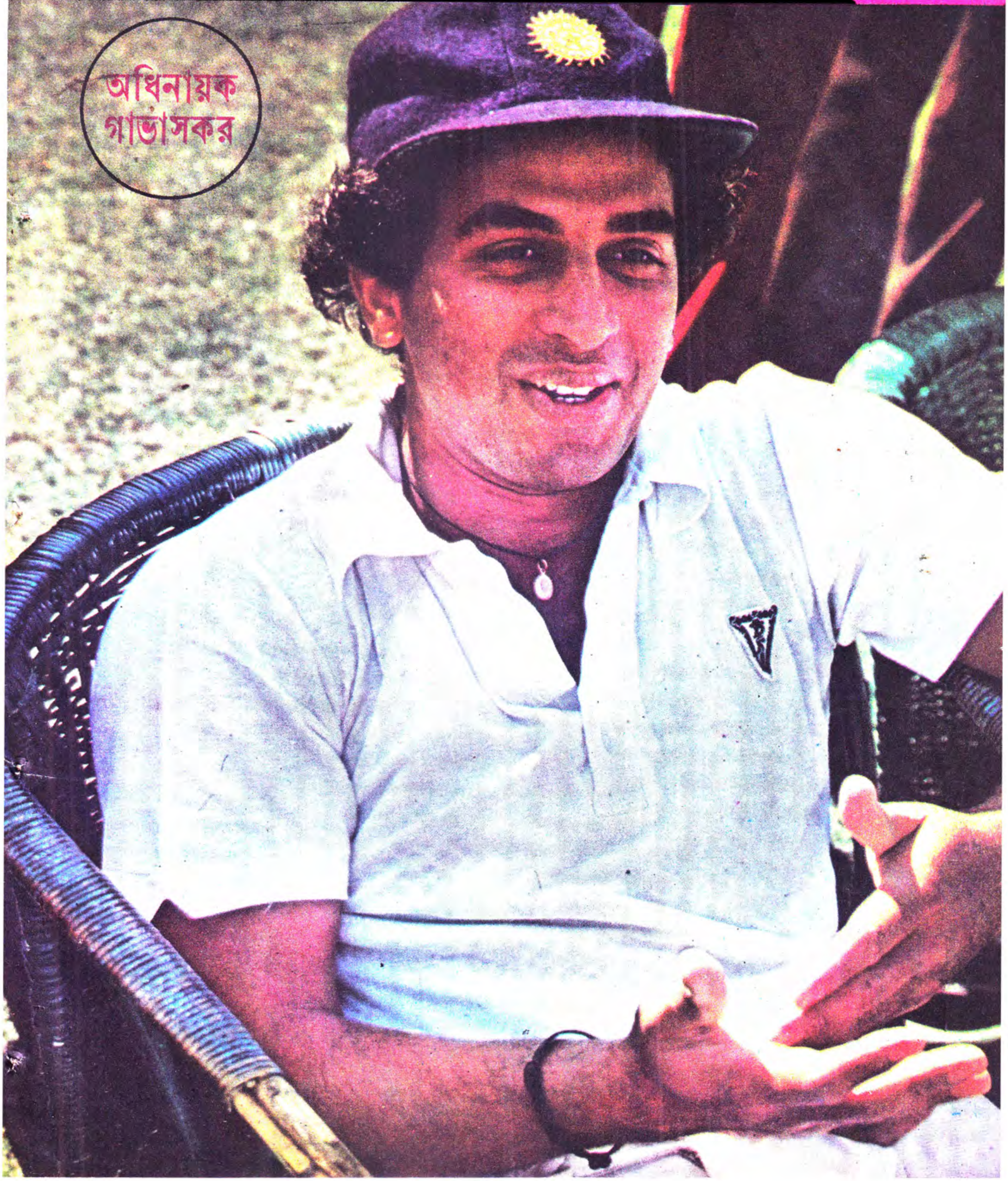
ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

৫-১২ অকটোবর ১৯



অধিনায়ক গাভাসকর



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



শিল্ড ফাইনালে /সমর তরফদার

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

বর্ষ ৩ ॥ সংখ্যা ২১ ॥ ৫ ও ১২ অক্টোবর ১৯৭৯

কলকাতার ফুটবল মরশুম শেষ হওয়ার পর এখন ক্রিকেটের পালা। এ মাসের শেষে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ। বছরের শেষে পাকিস্তানের সঙ্গে। ক্রিকেট ছাড়া আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এবং নতুন বছরের প্রথম দু'মাসে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন, এশিয়ান কবাডি, রেনে ফ্রাঙ্ক হকি এবং এশিয়ান টেবল টেনিস ছাড়া ডিসেম্বরে দুর্গাপুরে জাতীয় টেবল টেনিসের আসর বসবে। খেলাধূলার আসর জমজমাট। তবে এর সঙ্গে লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের ডামাডোলের ব্যাপারটাও থেকে যাবে।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং অগণিত পাঠক পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, লেখক লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও সকল সুহৃদদের ৺শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানালাম আমাদের পত্রিকা ও ইত্যাদি প্রকাশনীর পক্ষ থেকে।

সম্পাদক ঃ অতুল মুখার্জ

শিল্প নির্দেশক ঃ নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা ঃ ১·৫০

বিমান মাশুল ঃ

পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা



যা আছে

ফুটবল ঃ

বিশেষ রচনা ঃ

ক্রিকেট ঃ

অন্যান্য ঃ

কার্টুন একেছেন ঃ রাজা ও আলি

এবারের প্রচ্ছদের ছবি তুলেছেন সমর তরফদার

অন্যান্য ছবি ঃ অমিয় তরফদার, পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অরুণ মুখার্জি, শঙ্কর নাগ দাস, স্পট নিউজ ও অন্যান্য।





পি কে কি অবসর নেবেন—না, দলবদল করবেন ?

স্টাফ রিপোর্টার ঃ কোচ পি কে ব্যানার্জি কি অবসর নিচ্ছেন ? পি কে তার ঘনিষ্ঠদের কাছে নাকি ওইরকম আভাস দিয়েছেন।

আই এফ এ শিল্ড ফাইনালের দিন খেলা শেষে তার একটি বক্তব্যও ভেবে দেখার। তিনি বলেছিলেন ঃ 'আর ভাল লাগছে না, আমি বড় ক্লান্ত।'

পি কে আরও বলেছিলেন—'প্রায় এক যুগ খেললাম। তারপর আট বছর ধরে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে কোচ করছি। প্রতিদিন আমাকে টেনশনে থাকতে হয়। ড্র করা চলবে না, হারলে তো কি অবস্থা সকলেই জানেন। মোটমাট জিততেই হবে প্রতিটি ম্যাচে। প্রতিটি ট্রফি চাই। বলুন—এ পারা যায় ? আমি বড় ক্লান্ত।'

অতএব ধরে নেওয়া যায়—পি কে অবসর নিচ্ছেন।

তবে ওর ঘনিষ্ঠ একটি মহল অবশ্য অন্য কথা বলছেন। তারা জানালেন, পি কে-র সঙ্গে সম্প্রতি মোহনবাগান কর্তৃপক্ষের বনিবনা হচ্ছে না। কয়েকটি ব্যাপারে দারুণ খটাখটি হয়ে গেছে। বিশেষ করে দিলীপ পালিতের ব্যাপারে পি কে কঠোর হলেও ক্লাবের কিছু কর্মকর্তা উল্টে দিলীপকেই মদত দিয়েছেন। তাই পি কে নাকি ঠিক করেছেন—ক্লাব যদি তাকে দায়িত্ব দিয়ে আবার খবরদারী করে তবে তিনি থাকবেন না। পি কে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে চলে এসেছিলেন ঠিক একই কারণে। শেষের দিকে ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষই ছিলেন যেন সব। কোচ ঠুঁটো জগন্নাথ।

অন্য মহলের খবর—পি কে আগামী মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের কোচ হতে চলেছেন। গতবারই ওরা অফার দেন। দেন ব্ল্যাঙ্ক চেক। কিন্তু পি কে নাকি বলেছিলেন, 'মোহনবাগানে তো বেশ আছি।'

তবে শেষ পর্যন্ত পি কে ইস্টবেঙ্গলে গেলে আগামী মরশুমে দলবদলের সময় নানা বদল হয়ে যেতে পারে। ইস্টবেঙ্গলের অনেকেই মোহনবাগানে চলে আসতে পারে। আবার মোহনবাগানের অনেকেই যাবে ইস্টবেঙ্গলে।





হাবিবের অভিনব প্রয়াস

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মহমেডান স্পোর্টিং-এর অধিনায়ক মহম্মদ হাবিব সেপ্টেম্বরে উত্তরবঙ্গে তার দলের একটি প্রদর্শনী ম্যাচে প্রাপ্ত দশ হাজার টাকা দিলেন ক্লাবের মালী আজিজকে। না, আজিজের হাতে ওই টাকা তিনি তুলে দেননি। আজিজের নামে ওই টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে দিলেন।

হাবিবকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, মাঠের মালীরা সারা বছর আমাদের সঙ্গে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। ওরা আমাদের মতই জয় পরাজয়ের সুখ দুঃখের অংশীদার।

আমরা অনেক কিছু পাই—কিন্তু সেই তুলনায় বড় ক্লাবের মালীরা দেড়শ, দু'শো টাকার বেশি পায় না।

হাবিব এরপর ওদের প্রবীণ মালী গৌরী বেরার জন্য প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবেন। কথা প্রসঙ্গে বললেন ঃ ইস্টবেঙ্গলের শংকর, মোহনবাগানের লক্ষ্মণ, গোকুলকে অনুরূপভাবে টাকা দেওয়া যেতে পারে।

শিল্ড-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ছিল অভিভাবকহীন

স্বরাজ ঘোষ ঃ আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগান ১-০ গোলে জিতেছে। কোন দল কেমন খেলেছে ও কে কেমন খেলেছে, তার বিচার সাংবাদিকরা সংবাদপত্রে, বিশেষজ্ঞরা রেডিও, টেলিভিশনে করেছেন। করে দিয়েছেন।

আমি, সত্তার ও ধনরাজ এবছরও ফাইনাল খেলার দিন বসেছিলাম ফোর্ট উইলিয়মের দিকে গোলপোস্টের পেছনে ফটোগ্রাফারদের বাঁ-দিকে। চমৎকার জায়গা। মাটিতে বসে পরিষ্কারভাবে গোটা মাঠটি একনজরে আসছিল। খেলাও পরিষ্কারভাবে দেখেছি। মুহূর্তগুলো খুব গভীরভাবে আলোচনা করছিলাম। সত্তার তার খেলোয়াড়ী জীবনে বহু অভিজ্ঞতার কথা বলছিল। আবার কোচিং পয়েন্ট নিয়েও কথা হচ্ছিল। যাই-হোক খেলার পর বাড়ি ফেরার পথে কতরকম মন্তব্যই না শুনেছি। আবার পরদিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু মন্তব্য পড়েছি।

ভেবেছিলাম এ নিয়ে আর আলোচনা করব না। করতে বাধ্য হলাম। তা না হলে একটা প্ল্যান্ট নষ্ট হয়ে যেত। আর কোচিং জিনিসটাও প্রকাশ পেত না। সেই প্ল্যান্ট হল ভাস্কর গাঙ্গুলি। সেদিনের খেলার পর বারবারই পুরনো কথা কানে বাজছিল—১৯৪০ সালের ফাইনালে এরিয়ানের কাছে মোহনবাগান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর মোহনবাগান সমর্থকদের একটি কথা—কে দত্ত ঘুষ খেয়েছে। কিন্তু ডি ব্যানার্জির অপূর্ব গোলগুলির তারিফ তো হল না। ওই গোলগুলো কি গোল হওয়ার মত ছিল না? কে দত্ত কি গোল খেতে পারেন না? চিরকালের জন্য কে দত্ত'র বদনাম হয়ে গেল। আর ডি ব্যানার্জিকে কেউ জানল না। সাবাস ক্রীড়ামোদীরা! এরিয়ানের খেলোয়াড় হলে কি বড় খেলোয়াড় হতে নেই? ভাস্কর গাঙ্গুলির বেলায় তা হবে কেন? যারা ওই গোল সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, ভাস্কর গাঙ্গুলির মারাত্মক ভুলের জন্য গোলটি হয়েছে, তারা যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে কি দেখতে পেয়েছেন যে বলটি কিভাবে গোলে ঢুকল? বরং আমরা গোল-পোস্ট-টু-গোলপোস্ট বসেছিলাম। কাজেই স্পষ্টভাবে দেখেছি যে বলটি ঘূর্ণির মত হয়ে গোলে ঢুকল। সাধারণত স্পিডের উপরে অতর্কিতে আউট স্টেপ পাঞ্চ সট করলে বল 'টরনেটো' সট হবে। তার উপর দৌড়ের উপর বল ১ ইঞ্চি, ২ ইঞ্চি, ৩ ইঞ্চি, ৪ ইঞ্চি অবধি বাম্প করতে করতে যায়। কাজেই পাঞ্চের সময় পায়ের ব্লেড অর্থাৎ পায়ের পাতা বলের তলায় চলে যাওয়ার সুযোগ হয়, কাজেই কতকগুলো বাড়তি সুযোগ পাওয়া যায়। যারা ওই ধরনের সট করতে পারে, তারাই জানে এই ধরনের সটের মূল্য কি। আমি ব্যক্তিগতভাবে বহু বড় বড় খেলায় এই সটে গোল করেছি ও গোলকিপার হতভম্ব হয়ে গোল খেয়েছে। ভাস্কর এগিয়ে এলে কি গোল বাঁচত? আর নিশ্চিত না হয়ে গোল লাইন ছাড়বে কেন? এগিয়ে এলেই কি ঘূর্ণি সট আটকাতে পারত? এবার কথা হল গৌতমকে ওই সট মারার সুযোগ কারা করে দিল। মনে পড়ে লিগের খেলায় মানস কিভাবে গোলটি পরিশোধ করেছিল ও ইস্টবেঙ্গলের চারটি ব্যাকের ওই সময় কি পজিসন ছিল। সে সম্বন্ধে আমি লিখেছিলাম—বলের অবস্থান অনুযায়ী চারটি ব্যাক কিভাবে ব্যালেন্স করবে। সেটা হল কন্‌ভেনসন। তার বলেছিলাম শুধরে নিতে। কিন্তু এদিনও নজরে এলো ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্স মোটিভেটেড ফুটবল জানে না। কাজেই ব্যালেন্সের নিয়ম জানে না। গৌতম যখন এগোচ্ছিল, তখন লেফট মিড ফিল্ড প্লেয়ার কোথায় ছিল? আর যদি না থাকে সেই জায়গাটা কভার করবে লেফট সেন্টার ব্যাক। আর সেও যদি কোন কাজ না করে বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য লেফট ব্যাক ট্যাকলে যাবে। কারণ ওটা স্কোরিং পজিশন। থাক না রাইট আউট অরক্ষিত। সে তো ডামি পজিশনে। ডাইরেক্ট গোল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজেই স্পষ্টই বোঝা গেল ম্যাসুজ ব্যাকের কাজ জানে না। আর ইস্টবেঙ্গল লিগের খেলার কথা ভুলে গেল কি করে। তারাই তো মোহনবাগানকে জিতিয়ে দিল। তাদের দুই মিড কিন্তু খেলোয়াড়ের বেশ নাম ডাক আছে। তাদের তো খুঁজে পাইনি সেদিন।

[illegible]দের সিংকে দেখে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। তখন ঢাকা শহরে গঙ্গা মিত্রার খুব নাম ডাক। যেমন উঁচুতে সট। তেমন এদিক ওদিক সট। আমাদের খুব ভাল লাগত। কিন্তু আজ কি আর ভাল লাগে? আজ ব্যাকেদের কাজ হল অন্যরকম।

মোহনবাগান সেই গতিতে খেলছিল, বারবারই আমি সত্তারকে বলছিলাম, শেষের পনের মিনিট ধরে বুঝতে পারবে তো। ঠিক তাই হয়েছিল। শেষের পনের মিনিট একরকম প্রায় আউট হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকে সেই মুহূর্তটির সুযোগ নিতে পারল না। ফুটবলের আসল খেলাই হল শেষের খেলা। ওই লগ্নে যুদ্ধ হয় ইঞ্চ-টু-ইঞ্চ। কাজেই পরিণত খেলোয়াড়রা নিশ্চয়ই হিসেবী হয়। এখন তাদের আরও হিসেবী হতে হবে। কারণ দুই হাফের দুই রকম খেলা। বিশেষতঃ দ্বিতীয়ার্ধে আবার দুই রকম।

দুই দলের অধিনায়করা দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কোন প্রমাণ রাখতে পারেনি। প্রশান্তর কথা বাদই দিলাম। তাকে দেখে মনে হয়েছে, তার দলটিকে ধরে রাখা বা পরিচালনা করার ক্ষমতা নেই। আর কম্পটন বার বারু ওই জায়গায় হরজিন্দরকে ব্লক ট্যাকল করে ফাউল করছিল কেন? সে তো তাই চাইছিল। ওই সময় মোহনবাগান ১-০ গোলে এগিয়ে যে কোন মুহূর্তে গোল পরিশোধ হতে পারত। তাকে ব্লক ট্যাকল না করে ক্লোজ করে দিলেই তো তার করার কিছু ছিল না। গায়ে তো আর সট মারবে না। আর ডান পায়ে হরজিন্দরের কোন কাজ নেই। যদি গোল পরিশোধ হত ওই সমস্ত ফাউল কিক থেকে, বলার কিছু ছিল কি? যাইহোক সম্পূর্ণ দলটিকে কণ্ডাক্টারের মত টেনে নিয়ে গেল গৌতম। আর গোলটিও চমৎকার। আর হিসেবীও বটে। কোচ প্রদীপ অভিভাবকের মত দলটিকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পেরেছেন।

আর ইস্টবেঙ্গল দলটি ছিল যেন অভিভাবক[illegible]





ছবি ঃ অমিয় তরফদার



টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম একশো বছরে মাত্র সতেরজন অল-রাউণ্ডারের কে সেরা (১)

দিলীপ সরকার : একশো বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে মোট ১৫৪০ জন ক্রিকেটার অংশ নিয়েছেন। ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং-এ রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে তারা ক্রিকেট বিশ্বকে নানাদিক দিয়ে তোলপাড় করেছেন। বরণীয় হয়েছেন এই ক্রিকেটারদের মধ্যে অনেকেই, কেউ বা স্মরণীয়। এদের মধ্যে মাত্র ১৭ জন নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন অল্-রাউণ্ডার হিসেবে। শতকরা হিসেবে সংখ্যাটা অতি নগণ্য। প্রায় ১.১ ভাগ মাত্র।

অতি বিরল এই অল-রাউণ্ডারদের মধ্যে আছেন সর্বাধিক অস্ট্রেলিয়ার সাতজন : আর বেনো, এ কে ডেভিডসন, জি গিফেন, আই ডবু জনসন, আর আর লিণ্ডওয়াল, কে আর মিলার এবং এম এ নোবল। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেস্ট অল-রাউণ্ডারের খ্যাতি কুড়িয়েছেন টি ই বেইলি, এ ডবু গ্রেগ, আর ইলিংওয়ার্থ, ডবু রোডস, এম ডবু টেট এবং এফ জে টিটমাস। ভারত, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আছেন একজন করে যথাক্রমে ভিনু মানকড়, গ্যারি সোবার্স, ইন্তিকাব আলম ও টি এল গডার্ড।

টেস্ট ক্রিকেটের দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই সেদিন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে আরও একজন—ইয়ান বোথামের নাম প্রতিষ্ঠিত হল অল-রাউণ্ডারদের তালিকায়। লিডস-এ ভারত-ইংল্যাণ্ড শেষ টেস্টে বোথাম হাজার রান ও শত উইকেট লাভের কৃতিত্ব পেলেন মাত্র ২০টা টেস্ট খেলে। এর আগে এতো কম টেস্টে কেউ 'ডাবল-'এর গৌরব পায়নি। ভারতের ভিনু মানকড় 'ডাবলের' রেকর্ডটি দখলে রেখেছিলেন ২৩টি টেস্টে।

ব্যাপারটা খুবই শক্ত—বিভিন্ন জেনারেশনের ক্রিকেটারদের সঠিক বিচারের তুলামূল্যে টেনে আনা। তবে ইচ্ছা শক্তির উপর ভর করে এবং দ্য উইসডেন বুক অব টেস্ট ক্রিকেটের সাহায্য নিয়ে আলোচনা করা যায়।

গত একশো বছরে ক্রিকেটের বহু নিয়ম পাল্টেছে, ঘটেছে নতুন সংযোজন। বিভিন্ন সময় পিচের তারতম্য, নানারকম মাঠের অবস্থান, নানা বয়সে ক্রিকেটারদের টেস্ট অঙ্গনে প্রবেশ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে।

আবার একটি শক্তিশালী পক্ষে থেকেই কি ক্রিকেটাররা অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করেননি? টেস্ট ক্রিকেটে 'ডাবল' পাওয়া গোড়ায় উল্লিখিত নামগুলির মধ্যে মাত্র চারজন আছেন (ককনার, গডার্ড, মানকড় ও কনস্টান্টাইন) যারা যে যে দলে খেলেছেন, তাতে বেশির ভাগই ফল হয়েছে পরাজয়। জয় হয়েছে সামান্য। আবার অনেকেই আর্মস্ট্রং, বেইলি, বেনো, গ্রেগরি, মিলার, নোবল যে দলে খেলেছেন সেই দলগুলো হারার চেয়ে জয়ের মুখ দেখেছে বেশি। যদি ওরেল, উইকস ওয়ালকট, হান্ট, কানহাই, নার্স ও বুচারের পরে প্রবেশ বলেই সোবার্সের উপরি লাভ ধরা হয়, তবে বলতে হয় তত্ত্বের দিক দিয়ে সে অপ্রয়োজনীয় এবং অতি বিশ্বাসের ব্যাপারগুলোর দিকেই বেশি ঝুঁকেছিল। অল-রাউণ্ডার হিসেবে হৈ চৈ তুলে পরে শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন, কেউবা বোলার হিসেবে।

রোডস শুরু করেছিলেন বোলার হিসেবে। প্রথম তিনটে সিরিজে ৬৬টি উইকেট পান। কিন্তু রান করেন মাত্র ২১১ ; পরে তিনি একজন ভাল ব্যাটসম্যান হয়েছিলেন এবং শেষদিকে উইকেট পেতেন খুব কমই। এমনই নাম হ্যামণ্ডের যিনি ১৯টি সিরিজে ৮টা উইকেট দখল করেছেন। অথবা উল্টো দখল করেছেন ১৪টা সিরিজে মাত্র ছয়টি উইকেট।

বিভিন্ন সময়ের ক্রিকেটাররা একে অপরের দেখা পাননি। সেজন্য পরস্পরের বিচারের সুযোগ নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার টি এল গডার্ড অবশ্যই কৃতজ্ঞ যে তাকে তিন দিনের টেস্টে স্টাম্প এ্যাটাকের ভূমিকায় দেখা যায়নি। ট্রুম্যান কখনো বল করেননি ব্র্যাডম্যানকে। কিন্তু লারউড করেছেন। হ্যামণ্ড ফেস করেছেন ও'রেইলিকে, তবে ডেভিডসনকে নয়। সোবার্স ব্যাট করেছেন বেনোর বিরুদ্ধে কিন্তু গ্রিমেটের বিরুদ্ধে নয়। মহাযুদ্ধের আগে হবস অনেক বেশি সুবিধা পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার গুগলি আক্রমণের ফলে। ডবু জি গ্রেস ছিলেন সব সেরা ব্যাটসম্যান তার সময়কার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে, বোলারদের মধ্যে নয়।

টেস্ট ম্যাচগুলি হয়েছিল তিন, চার বা পাঁচ দিনে। আমরা অবশ্যই একজন বোলারের পরীক্ষা করব স্ট্রাইকিং রেট দেখে। সেটা হচ্ছে প্রতি উইকেটে তার বলগুলির সংখ্যা। ১৯৫৬ সালে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লেকারের অবদান ছিল ১৬.৪-৪-৩৭-৯ কিন্তু আগের বছর লিডসে টি এল গডার্ড ইংল্যাণ্ডের



বোথামের শততম উইকেট : মাইক ব্রিয়ারলি একহাতে ক্যাচ ধরে গাভাসকরকে আউট করছে



হেডিংলে টেস্টে ঘাউড্রির বলে হুক মারছেন ব্যাটসম্যান বোথাম

দ্বিতীয় ইনিংসে বল করেন : ৬২-৩৭-৬৯-৫। •

এক্ষেত্রে লেকার পান প্রতি ১১টা বলে একটা উইকেট, কিন্তু গডার্ড প্রতি ৭২টায় একটি। উভয় ক্ষেত্রেই তাদের দল জয়ী।

প্রথমে অস্ট্রেলিয়ার এ কে ডেভিডসনের কথাই বলা যাক। অসাধারণ নজীর রেখেছিলেন তিনি ১৯৬০-৬১ সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে। ডেভিডসন এই ম্যাচে রান করেন ৪৪ ও ৮০ এবং সেই সঙ্গে উইকেট পান ১৩৫ রানে পাঁচটি এবং ৮৭ রানে ছয়টি। এই ম্যাচটিই টেস্ট ক্রিকেটের ৫০০তম এবং একটি মাত্র ম্যাচই টাই হয়েছে। ৩১০ মিনিটে ২২৩ রান করলে অস্ট্রেলিয়া জয় পাবে তখন তাদের শেষ উইকেটটি রান আউট হয়ে যায় শেষ ওভারের সপ্তম বলে। ফলে স্কোর থেকে যায় সমান সমান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৪৫৩ ও ২৮৪ রান। অস্ট্রেলিয়া ৫০৫ ও ২৫২ রান।

ডেভিডসনই তখন প্রথম ও একমাত্র প্লেয়ার যে ম্যাচ ডাবল পায় ১০০ রান ও ১০টি উইকেট কোন এক টেস্টে। ওই ম্যাচেই সোবার্স প্রথম ইনিংসে ১৩২ রান করে টেস্টে তার ৩ হাজার রান পূর্ণ করেন।

ডেভিডসন টেস্ট খেলেছেন ৪৪টি। তার মোট ১৩২৮ রানের মধ্যে সর্বোচ্চ রান ৮০; উইকেট পেয়েছেন মোট ১৮৬টি। সবসেরা বোলিং ৯৩ রানে সাত উইকেট।

প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৫৩ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। নটিংহামে হয়েছিল প্রথম টেস্ট। এই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টেও প্রথম ইনিংসে ৭৬ রানই তার উল্লেখযোগ্য।

এরপর এগারোটা টেস্টে তিনি কোন ইনিংসেই ৩০-এর বেশি রান করেননি এবং তিনের বেশি উইকেটও পাননি। হৈ চৈ-এর কারণ ঘটালেন তিনি '৫৭-'৭৮ সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৪ রানে ছয় উইকেট পেয়ে। পঞ্চম টেস্টে পেলেন ৯টি উইকেট মাত্র ৪২ রানে।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ('৫৮-'৫৯) দ্বিতীয় টেস্টে ডেভিডসনের ৬৪ রানে ৬ এবং ৪৩ রানে ৩ উইকেট পাবার সুবাদেই মূলত অস্ট্রেলিয়ার ৮ উইকেটে জয় হয়েছিল।

ভারতের মাটিতে ডেভিডসনের জীবনের সেরা বোলিং ঘটল এবং ভারতের পক্ষেও হলো এক স্মরণীয় টেস্ট ১৯৫৯-৬০ সিরিজে। সেবার ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ডেভিডসন উইকেট পেলেন ৩১ রানে পাঁচটি এবং ৯৩ রানে সাতটি। দ্বিতীয় ইনিংসে দখল করা সাত উইকেটই ডেভিডসনের জীবনের সেরা টেস্ট বোলিং।

ভারতের প্রথম ইনিংসে ডেভিডসনের পাঁচ উইকেট ছাড়াও বেনো দখল করেন ৬৩ রানে চার উইকেট। ১৫২ রানে সেবার ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিল। ভারতীয়দের পক্ষে সর্বোচ্চ রান (২৫) করেন বাপু নাদকার্নি। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করে ২১৯।

জাসু প্যাটেলের বোলিং ছিল ৩৫·৫-১৬-৬৯-৯; ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে রান হয় ২৯১। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে আবার ধস সৃষ্টি করেন প্যাটেল ৫৫ রানে পাঁচ এবং উমরিগড় ২৭ রানে ৪ উইকেট নিয়ে।

ভারতের জয় হয় ২৪ রানে, ২৪ ডিসেম্বরে কানপুরের গ্রীন পার্কে। ঐতিহাসিক জয়। ১৯৪৭ থেকে ১০টি টেস্ট খেলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেবারেই ভারত পেল প্রথম সাফল্য।

জাসু প্যাটেল শক্ত পিচে তার অফ-স্পিন দ্বারা টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ উইকেট দখলের নজীর গড়লেন। ঠিক আগের বছর একই মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সুভাষ গুপ্তে ৯ উইকেট পেয়েছিলেন ১০২ রানের বিনিময়ে। প্যাটেল আজও পর্যন্ত একমাত্র ভারতীয় যিনি একটি টেস্টে ১৪টি উইকেট পেয়েছেন।

যাই হোক, টাই টেস্টের পরের টেস্টে অস্ট্রেলিয়া সাত উইকেটে হারায় মূলত প্রথম ইনিংসে ডেভিডসনের দুর্দান্ত বোলিং-এর জন্য। ডেভিডসন সেবারে জাঁদরেল সব ক্যারিবিয়ান সোলেমান, নার্স, কানহাই, আলেকজাণ্ডার, রামধন ও হলকে ক্রিজ থেকে ফিরিয়ে দেন উগ্রমূর্তি ধারণ করে।

সেবারে তৃতীয় টেস্টেও ডেভিডসন ৮টি উইকেট পেয়েছিলেন।

তার আর এক স্মরণীয় টেস্ট ১৯৬১-তে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে। বৃষ্টিতে প্রথম দিনের খেলা শুরু হয় মধ্যাহ্ন ভোজের আরও এক ঘণ্টা পর। সিম্পসন ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ করে দেন ২৬টি বলে চার রানে শেষ দু'টি উইকেট নিয়ে। ইনিংসে তার বোলিং ছিল ১১·৪-৪-২৩-৪; ডেভিডসন পান ৭০ রানে ৩ উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার ১৯০ রানের প্রত্যুত্তরে ইংল্যাণ্ডের হয় ৩৬৭ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ডেভিডসন ২০ রান করে (৬+৪+৪+৬) এলেনের একটি ওভারে এবং শেষ উইকেটে ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে যোগ করেন ৯৮ রান। ডেভিডসন ৭৭ রানে অপরাজিত থেকে যান। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৪৩২ রানে শেষ হবার পর ডেভিডসন ও বেনো আবার সাংঘাতিক হয়ে ওঠেন বোলিং-এ। ইংল্যাণ্ডের ২০১ রানে শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া জয় পায় ৫৪ রানে। বেনো শেষ বিকেলে পান ২৫ বলে ১২ রান এবং ৫ উইকেট। মাঝে ওই ম্যাচে ৭টি ক্যাচ ধরে সমান করেছিল ইংল্যাণ্ডের টি জি ইভান্সের রেকর্ড। ইভান্স ১৯৫৬-তে লর্ডসে ওই রেকর্ড করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে।

'৬২-'৬৩ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্টে হেরে তৃতীয়টিতে ইংল্যাণ্ডকে হারায়, ডেভিডসনের ৫৪-৪ ও ২৫-৫ উইকেট লাভের জন্য। প্রথম ও পরের দু'টি টেস্ট ড্র হয়েছিল।

এই সিরিজেই ডেভিডসনের জীবনের শেষ টেস্ট। চতুর্থ টেস্টে ডেভিডসন চতুর্থ ওভার বল করার সময়ে পেশীতে চোট পান।

(চলবে)

কিউটিকিউরা কন্যা
স্বভাবতঃই স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ-বন্যা









একটাই ট্যাল্ক পাউডার — কিউটিকিউরা
যা ওকে সর্বক্ষণ রাখে উজ্জ্বল, উচ্ছল!

এতই সূক্ষ্ম ও কোমল যে যেন ওর মুখে
মেঘের হাল্কা পরশ বুলিয়ে দেয়।

ফুলের সৌরভে ভরা এই ট্যাল্ক
ওর সর্ব অঙ্গ থেকে
স্বাভাবিক সুগন্ধ ছড়ায়।

ভোরের বাতাসের মত
শীতল পরশে ওকে রাখে
কোমলা, তরতাজা।
দিনের প্রতি পল, প্রতি ক্ষণ
ওর লাগে অপূর্ব সুন্দর!



কিউটিকিউরা ট্যাল্ক
**সব মেয়েরই প্রিয় পাউডার—
আর সেটাই তো স্বাভাবিক।**

সাব্বির আলি আপস অ্যাণ্ড ডাউনস মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে



সাব্বির আলি / শাহজী

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : '৭৮-এর লিগ। ইস্টবেঙ্গল বনাম ভ্রাতৃ সংঘের খেলা। দিনটা ছিল বুধবার। তারিখ দোসরা আগস্ট। বেলা দশটা-এগারোটা থেকেই দলে দলে লোক ছুটেছে লাইন লাগাতে। খেলাটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ? না। এই ম্যাচেই কি ইস্টবেঙ্গলের স্বপক্ষে লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন নির্ধারিত হবে? তাও নয়। বরং তিন পয়েন্ট হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল লিগ জয়ের সম্ভাবনা থেকে পিছিয়েই গেছে। তা যাক। তবু ইস্ট-সমর্থকরা সকলেই মাঠে যেতে চাইছেন। কারণ, আজ সাব্বির আলি নামছে। সাব্বির সবচেয়ে আলোচিত নামটি। আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রে সই করে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েও এখন পর্যন্ত একটি ম্যাচেও সে খেলতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত তার ট্রান্সফার সংক্রান্ত গণ্ডগোল মিটেছে। তাই সাব্বির খেলছে আজ। এবং সে কারণেই এত ব্যাপক উৎসাহ, বিরাট আগ্রহ ও উদ্দীপনা।

কোন বড় দলের একটা সাধারণ খেলায় এত ভিড় সাম্প্রতিককালে দেখা যায়নি। মাঠে যত লোক ঢুকতে পেরেছে, না ঢুকতে পারায় আশাহত হয়েছেন তারও বেশি। সাব্বির সম্পর্কে কিছুদিন ধরে তারা অনেক কিছু শুনছেন—সাব্বির ভালো স্ট্রাইকার, দারুণ হেড করে, গোল করায় দক্ষ, মহারাষ্ট্রের নামী খেলোয়াড় এবং ভারতের জামা গায়ে চাপিয়েছে বার কয়েক। এই বিশেষণগুলো এবং তার সঙ্গে এতগুলো ম্যাচে অনুপস্থিতি সাব্বির সম্পর্কে সকলের কৌতূহল ও আগ্রহকে বাড়িয়ে দিল।

স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন প্লাবনের মাঝ দিয়ে সে খেলতে নামল কলকাতার লিগ ফুটবলে তার প্রথম ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গল পাঁচ গোলে হারাল ভ্রাতৃ সংঘকে। পাঁচের মধ্যে তিনটি গোলের পিছনেই রয়েছে সাব্বিরের অবদান। সাব্বির ভালো খেলল। মন জয় করল ইস্ট-সমর্থকদের।

পরের ম্যাচ মোহনবাগানের সঙ্গে। লিগ থেকে পিছিয়ে গেলেও ইস্টবেঙ্গল সদস্য-সমর্থকরা এতদিন এই ম্যাচটার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থেকেছে। মনোভাব ছিল; লিগ না পাই, অগো হারাইতে অইবো। এবং প্রথম ম্যাচেই সাব্বিরের ভালো খেলা ওদের মনোভাবকে আরও দৃঢ় করে তুললো ও প্রত্যাশাকে বাড়িয়ে দিল। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে মাঠে হাজির হল সকলে।

কিন্তু মোহনবাগানের কাছে এক গোলে হেরে গেল ইস্টবেঙ্গল। এবং সাব্বির ফ্লপ করল। কেন? আসলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইস্ট-মোহনের ম্যাচে নার্ভ এবং টেনশন ব্যাপারটা কাজ করে। আর ইস্টবেঙ্গল-ভ্রাতৃ ম্যাচের পরেই হল দু'প্রধানের যুদ্ধ। সাব্বিরের মনের মধ্যেও কি সেদিন স্নায়ুর চাপ বা সেরকম কিছু কাজ করেছিল? 'না, স্নায়ুর চাপে আমি ভুগিনি। তবে দলে আমি নতুন ছিলাম। এই ভাইটাল ম্যাচের আগে একটি মাত্র খেলাতেই টিমের হয়ে আমি মাঠে নেমেছি। তাই নিজেকে সেদিন ঠিকমত মানানসই করে তুলতে পারিনি।' আর সাব্বিরের নিজের খেলা সেদিন না খেলতে পারার পিছনে মোহনবাগান-স্টপার সুব্রত ভট্টাচার্যের দায়িত্বও ছিল। সুব্রত সেদিন সাব্বিরকে অনেকটা অকেজো করে দিয়েছিল, বিশেষ করে তার মূল অস্ত্র হেডকে। সাব্বির সম্পর্কে আশার বেলুনটা চুপসে গেল।

এরপর লিগের বাকি ক'টি খেলায় সে খেলল। গোল পেল দুটি। একটি বি এন আর, আর একটি এরিয়ানের বিপক্ষে। '৭৮-এর লিগে মাত্র দু'টি গোলপ্রাপক (সম্ভবত পাঁচটি ম্যাচে) সাব্বির '৭৯-র লিগে করেছে ২৩টি গোল। এবং কলকাতার ফুটবল লিগে দ্বিতীয় বছরেই তার নামের পাশে লেখা হয়েছে যুগ্ম সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান। অবশ্যই কৃতিত্বের কাজ। কিন্তু সেকথা পরে।

আগে '৭৮-এর কাহিনী। লিগের পর ইস্টবেঙ্গল গৌহাটিতে বরদলুই ট্রফি খেলতে গেল এবং যোগ্য দল হিসাবে বিজয়ীও হল। আসাম পুলিশের বিপক্ষে দ্বিতীয় দফায় সেমিফাইনালে দলের হয়ে একাই তিনটি গোল করে সাব্বির পেল হ্যাটট্রিকের গৌরব। ইস্ট-বেঙ্গলের হয়ে এটাই তার প্রথম বড় সাফল্য। ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল হারাল ব্যাঙ্ককের পোর্ট অথরিটি দলকে ৪-২ গোলে, তুমুল ও তীব্র লড়াইয়ের পর। সাব্বির সেদিনও ভালো খেলল।

গৌহাটি থেকে আবার কলকাতায়, এবার আই এফ এ শিল্ডের আসরে। সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল হেরে গেল আরারাতের কাছে ০-১-এ, ৮৬ মিনিট পর্যন্ত যুঝে। কিন্তু লিগের মত শিল্ডের এই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইতেও সাব্বির তেমনভাবে দর্শকের চোখ টেনে রাখতে পারল না। সাব্বির বলছে—কেউ কেউ বলল, আমি ভালো খেলেছি। আবার অনেকের মন্তব্য ভালো খেলতে পারিনি। দু'য়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার বক্তব্য; আমি যথাসাধ্য লড়েছি।'

অতঃপর কাশ্মীরের জাতীয় ফুটবল। সাব্বির বাংলা দলে সুযোগ পেল না। যদিও প্রথমে সম্ভাব্য টিমে তার নাম ছিল, কিন্তু চূড়ান্ত দল থেকে সে বাদ পড়ে। এর আগে তিনবার জাতীয় ফুটবলে সে খেলেছে মহারাষ্ট্রের হয়ে ৭৩, ৭৫ ও ৭৬-এ, শুধু ৭৪-এ খেলতে পারেনি জণ্ডিসে আক্রান্ত হবার জন্য। গতবছর কলকাতার জাতীয় আসরে তার খেলার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তার আগেই সে ইস্টবেঙ্গলে খেলবার জন্য আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রে সই করেছে। কাশ্মীর ন্যাশনালে তার চান্স হল না।

তারপর ৭৮-এর ডুরাণ্ড। ইস্টবেঙ্গল বিজয়ী হল। সাব্বিরের জবানীতে—কয়েকজন সিনিয়র প্লেয়ারের সঙ্গে কঠোর প্র্যাকটিস করেছি ডুরাণ্ড যাবার আগে। বদ্ধপরিকর ছিলাম—যেভাবে হোক, ডুরাণ্ড দখল করতে হবে। দিল্লিতে পৌঁছবার পরও আমাদের কঠিন অনু-শীলন শিথিল হয়নি বিন্দুমাত্র। এবং তাই, ফলও পেয়েছি।'

এরপর এবারের কথা। কিন্তু সেকথা বলার আগে আমাদের আর একবার ৭৮-এ ফিরতে হবে। ওয়েলিংটনের ওয়াই এম সি এ হোস্টেলে সাব্বিরের ঘরে বসে (একই রুমে মীর সাজ্জাদও থাকে) কথা বলছি। এখানে আসার পথে লোটাস সিনেমার উল্টোদিক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সাব্বিরের কাছে জানতে চেয়েছিলাম—কলকাতা কেমন লাগছে? —'ফাইন।' প্রশ্ন করেছিলাম—এখানকার দর্শক সম্পর্কে অভিমত কি? দোকান থেকে একটা পান কিনে মুখে পুরে সে বলল '—কলকাতার দর্শকরা প্লেয়ারদের খুব সম্ভ্রম দেন। ওরা ফুটবল

→

ভালবাসেন। ওদের ফুটবল-প্রীতি মুগ্ধ করার মতই।'

শিল্ড কোয়ার্টার ফাইনালে ট্যালিগঞ্জ অগ্রগামীকে চার গোলে হারাবার পরের দিন, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যাবেলায় আমাদের সাক্ষাৎকার নির্দিষ্ট ছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল সাব্বির। তার বাঁ পায়ে চোট, আগে ছিল ডান পায়ে। ঘরে ঢুকে আমাকে বসতে দিয়ে সাব্বির টেপ রেকর্ডারে তোলা জনপ্রিয় হিন্দী গান চালিয়ে দিল। তবে খুব আস্তে। গান সে ভালবাসে—হিন্দী ও ইংরেজী দুটোই। এখন বাজছে 'মিলন' ছবির সেই অতি জনপ্রিয় গান

—'শাঁওন কা মাহিনা
পাওন কারে শোরে।'

সাব্বির উঠে গিয়ে গানের ভল্যুম একবার চড়িয়ে আবার মৃদু করে দিয়ে আমার সামনে এসে বসতেই প্রশ্নটা রাখলাম—৭৮-এ লিগের দীর্ঘদিন যখন বাইরে বসে কাটাতে হয়েছে, মানসিক অবস্থা তখন কিরকম ছিল? নৈরাশ্য কি অাঁকড়ে ধরেনি? সাব্বির বলছে, ধীরে ধীরে—'স্বভাবতই সে সময় আমি খুব আপসেট হয়ে পড়েছিলাম। তবে কখনো ভেঙে পড়িনি। আরও যে ক'জন ফুটবলার আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রে সই করেছিল, তারা সবাই ফিরে গেছে। কিন্তু আমি যাইনি। এদিকে সে সময়ে পুরনো কেন্দ্র বোম্বের দু-তিনটে ভাল দল আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, সেখানে ফিরে যাবার জন্য। কিন্তু সে ইচ্ছে আমার চিন্তাতে ঠাঁই পায়নি। কলকাতায় ফুটবল খেলতে এসে ফিরে যাবো—এটা হতেই পারে না। তাই আশাকে সম্বল করে অপেক্ষা করে গেছি। ভেবেছি, আমার ছাড়পত্রজনিত সামান্য সমস্যার নিশ্চয়ই সুরাহা হয়ে যাবে। শান্তদা এই সময়টায় আমাকে অত্যন্ত হেল্প করেছে। এবং বড় ভাইয়ের মত গাইড করেছে। ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কে চাকরি পাবার ব্যাপারেও তার অবদান ছিল।' —সাব্বির ধীরে এবং মেপে কথা বলা ছাড়াও আমি যখন তার আলোচনা নোট করছিলাম তখন সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি লাইন ফলো করছিল, যাতে এমন কোন শব্দ না থাকে বা প্রকাশিত না হয়, যেটা বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে।

গত বছর মরশুমের মাঝামাঝি সময় থেকেই ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা দলে ভিন্‌রাজ্যের নামী তারকা জড়ো করতে কোমর বেঁধে আসরে নেমে পড়েন। তারপর আমরা একে একে ইস্টবেঙ্গল দলে যোগ দিতে দেখলাম পাঞ্জাবের তিন খেলোয়াড় গুরদেব, হরজিন্দর ও মনজিত সিং, কর্ণাটকের দেবরাজ ও টমাস ম্যাথুজ এবং তামিলনাড়ুর ডেভিড উইলিয়ামসকে। একাধিক তারকার সমাবেশের ফলে দলে সাব্বিরের সুযোগ পাওয়া সম্পর্কে সর্বত্র যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিল। এবং তা অমূলকও ছিল না। আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্র এবং ঘরোয়া দলবদলের পরে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়-সংখ্যা দাঁড়াল—সুরজিত সেনগুপ্ত, মিহির, ডেভিড, হরজিন্দর, সুভাষ ভৌমিক, অশোক চন্দ, মীর সাজ্জাদ, মনজিত সিং এবং সাব্বির আলি। সকলের ফাঁক দিয়ে শেষোক্ত জনের পক্ষে দলে ঢোকা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল, সন্দেহ নেই। তার উপর মরশুমের মাঝামাঝি সময় থেকে মিহিরও খুব ভাল খেলছিল। এছাড়া আছে ডেভিড, দাবীদার মনজিতও। তবু সাব্বির বদ্ধপরিকর ছিল—সে টিমে আসবে। তার কথায়—আমি কখনো কোন কিছুকে হাল্কাভাবে নিইনি। যে যাই বলুক—আমি নিশ্চিৎ ছিলাম, সুযোগ পাব। কারণ, আমি পরিশ্রম করেছি (আগেও করতাম)। জানি, যদি পরিশ্রম বা অনুশীলনে ঘাটতি না থাকে তাহলে যা চাওয়া বা প্রত্যাশা থাকে তা মেলে। আমি বিশ্বাস করি, খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিনে একজন খেলোয়াড়ের দক্ষতা প্রমাণিত হয় না, হয় মাঠে।' —শেষের কথাগুলো বলার সময় সাব্বিরের চোখে মুখে প্রত্যয় মাখা দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠছিল।

সাব্বির কথা রেখেছে নিজের। সুযোগ করে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের

ফার্স্ট ইলেভেনে। এবং এক নম্বর স্ট্রাইকার হিসাবে নিজেকে পরিগণিত করেছে। যদিও লিগের প্রথমদিকে আড়াইটা ম্যাচ সে খেলেনি —স্পোর্টিং ইউনিয়ন, বি এন আর এবং ইস্টার্ন রেলের বিপক্ষে প্রথমার্ধে। কেন? —'এ ব্যাপারে আমার কিছুই বলার নেই। আমার তরফে তৈরি ছিলাম— সুযোগ পেলে ভাল খেলার জন্য। তবে ওই সময় দিন তিন-চারেক অসুস্থও ছিলাম। জানতাম—সুযোগ আসবেই।'

এলও। সাব্বির খেলল, রেগুলারই। এবং শুধু খেললই না, ২৩টি গোল দিয়ে মানসের সঙ্গে লিগের যুগ্ম সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মানও পেল। হ্যাটট্রিক করল তিনটি—রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব, ক্যালকাটা জিমখানা এবং জর্জের বিপক্ষে। সাব্বিরের ২৩টি গোল বা তিনটি হ্যাটট্রিকের পিছনে সুরজিতের অবদান অনস্বীকার্য। আমরা সুরজিতকে বার বার দেখেছি সাব্বিরের পথ খুলে দিতে। সাব্বিরও বলছে—হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, আমার গোল করার পথে সুরজিত প্রচুর সহায়তা করেছে।

এর আগেও নানা প্রতিযোগিতায় সাব্বির গোল করেছে। গোল করতে সে ভালবাসে। ৭৩-এর জাতীয় ফুটবলে মহারাষ্ট্র সেমিফাইনালে, ৭৫-এ কোয়ার্টার ফাইনালে এবং ৭৬-এর আসরে ফাইনালে উঠেছিল। তিনটি আসরেই সাব্বিরের নামের পাশে লেখা হয়েছে কয়েকটি গোল। এর মধ্যে ৭৬-এর পাটনা জাতীয় ফুটবলে সে গোল দিয়েছে ছয়টি। ৭২-এর ব্যাঙ্কক, ৭৩-এর তেহরান এবং ৭৪-এর ব্যাঙ্কক এশীয় যুব ফুটবলে সাব্বির ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং প্রতিবারই গোল করেছে। ৭৪-এ ব্যাঙ্ককের আসরে সে ছিল দলের ক্যাপ্টেন। এবং ভারত ইরানের সঙ্গে যুগ্মবিজয়ীর গৌরব পায়। প্রতিযোগিতায় ভারত মোট নয়টি গোল দিয়েছিল, তার মধ্যে সাব্বিরের রয়েছে পাঁচটি গোল। মারডেকা প্রতিযোগিতায় ৭৬-এ ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছে। ৭৫-এ ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত মারা হালিম ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত বিপক্ষ জালে বল ঢুকিয়েছিল ১১ বার, তার মধ্যে পাঁচ বার গোল ঢুকিয়েছে সাব্বির, বাকি ছ'বার ইন্দার সিং। ৭৬-এ সে কাবুল সফর করেছে ভারতের হয়ে। ৭৭-এ খেলেছে সিওলের প্রেসিডেন্ট কাপ এবং ঢাকার আগা খাঁ গোল্ড কাপে। ৭০ সালে টাটা স্পোর্টস ক্লাবের হয়ে সর্বাধিক গোল দিয়েছিল জহর দাস, ঠিক তার পরেই স্থান ছিল সাব্বির আলির। কিন্তু একটি লিগ সিজনে ২৩টি গোল দিয়ে যুগ্ম সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার সে এই প্রথম পেল। সেদিক থেকে ৭৯-র লিগ সাব্বির অবশ্যই মনে রাখবে।

এবারের লিগে তার সেরা গোলটি হয়েছে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিপক্ষে। পেনাল্টি বক্সের উপর থেকে একটি তৎপর ও চকিত ভলি সট দ্বারা সে গোলটি করেছে। টালিগঞ্জের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল জয় পেয়েছিল ওই এক গোলেই। সাব্বির যেমন গোল করেছে, তেমনি মিসও করেছে অনেক। এটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতেই সাব্বির বলল—কি করব বল, সুযোগ মিস করাও তো খেলার একটি অঙ্গ।

৭ জুলাই ইস্ট-মোহনের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সে একটি গোল করেছে। দু-প্রধানের লড়াইয়ে যে কোন গোলই অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু একটি গোল দিলেও দুটি সহজ সুযোগও নষ্ট করেছে সে। অবশ্য সাব্বিরের মতে—দুটি নয়, একটি গোলের অপারচুনিটি আমি সেদিন নষ্ট করেছি। সেটা ঘটেছে খেলা শুরুর চার মিনিটের মাথায়। বলটা অনেকটা প্রতাপের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। আমি বরাবর 'ফার্স্ট টাইম' সট নিই এবং এতে গোলও পাই। ওক্ষেত্রেও আমি প্রথম সুযোগেই সট নিয়েছিলাম, কিন্তু বলটা আমার সামান্য 'আউট অব রিচ' ছিল। আসলে আমি ধারণা করতে পারিনি, সুব্রত বলটা ফস্কাবে।

আর দ্বিতীয়, অর্থাৎ দেবরাজের মাটি ঘেঁষা সটটা আমি দেখতেই পাইনি। পেলে নিশ্চয়ই আমার পায়ে লেগে বলটা বাইরে চলে আসত না, গোলেই ঢুকত। কারণ, বলটা এমনভাবে আসছিল, ঠিকমত স্পর্শ করলেই গোল হত।

লিগে মোহনবাগানের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট ভালো খেলেও সহজ জয় ধরে রাখতে পারেনি। ম্যাচ ড্র হয়েছিল। এবং তাই, সকলের ধারণা হয়েছিল, লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রশ্নের সমাধান করতে দু দলের মধ্যে প্লে-অফ খেলা অবশ্যম্ভাবী। এবং ঘটনাবলী সেদিকেই এগোচ্ছিল। কিন্তু মহমেডানের সঙ্গে ড্র করায় ইস্টবেঙ্গল লিগ থেকে ছিটকে গেল। বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ পেয়েও ফরোয়ার্ডরা তা কাজে লাগাতে পারেনি। সমাপ্তির ছ'মিনিট আগে সাব্বিরকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। খেলা শেষ হতে তখন আধ মিনিট বাকী। সুরজিতের কাছ থেকে বল পেয়ে মরিয়া প্রচেষ্টায় ছুটতে লাগল ডেভিড। ঢুকে পড়ল ভিতরে। এবং বাড়াল সেই চমৎকার মাইনাসটা। পা, হাঁটু, থাই পেট—যে কোন জায়গা দিয়ে ঠেলতে পারলেই গোল ছিল। কিন্তু পারল না। পারল না মিহির এবং সাব্বিরের পরিবর্তিত কাজলও। সাব্বির এই মিসটা দেখেনি, তার আগেই ক্লান্ত দেহ নিয়ে ড্রেসিংরুমে চলে গেছে বিশ্রাম নিতে। তবে শুনেছি, পি কে নাকি বলেছেন, সাব্বির মাঠে থাকলে এক্ষেত্রে গোল হবার ষোল আনা সম্ভাবনা থাকত।

লিগের পর শিল্ড। কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল চার গোলে হারাল টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে। সেমিফাইনালে দক্ষিণ-কোরিয়ার বিপক্ষে দারুণ খেলে ৫—৪ গোলে (টাইব্রেকারে) জিতল। সাব্বির এই ম্যাচ খেলতে পারেনি জ্বরের জন্য। কিন্তু ফাইনালে মোহনবাগান অসম্ভব ভালো খেলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে এক গোলে হারিয়ে শিল্ড জিতে ছক উল্টে দিল। সাব্বির এই ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমেছিল, তেমন কিছুই করতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গল লিগ পেল না, শিল্ডও না। দলের এই রেজাল্ট খেলোয়াড়দের মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ফেলতে বাধ্য। সাব্বিরদের এখন লক্ষ্য থাকবে পরবর্তী টুর্নামেন্টগুলোতে সফল হবার জন্য, যথা— ডি সি এম, রোভার্স, ডুরাণ্ড ইত্যাদি।

★

রেকর্ড প্লেয়ারে তখনো গান বাজছিল। সাব্বির আলি মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে তাল রেখে গুণ গুণ করে উঠছিল। এর মাঝে কয়েকজন লোক এই ঘরে এসেছেন, গেছেন। সাব্বির উঠে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছে, বিদায়ও। একজন তাকে একটি বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট দিল। সে সিগারেট খায় না।

ওর পরিবারের আর কেউ তেমন করে ফুটবল খেলেনি। কিন্তু অল্প বয়স থেকেই তাকে ফুটবলে পেয়ে বসল। বাড়ির উল্টোদিকে একটা ➡



বিপক্ষ রক্ষণের কাছে সাব্বির ভয়ের কারণ / পাহাড়ী



মাঠ ছিল, ছোটবেলায় সেখানে সকলের সঙ্গে (দাদারাও খেলত) মনের আনন্দেই সে ফুটবল খেলত। এবং বেশী করেই খেলত। তার এই ফুটবল খেলাটা এবং এর প্রতি এত আকর্ষণ বাড়ির লোকেরা ভালো চোখে দেখতেন না। তাদের কাছে কখনোই পড়াশুনার উপর খেলাধূলা স্থান পেত না। কিন্তু তবু তার খেলা থেমে থাকল না। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে সেটা এগোতে থাকল অপ্রতিহত। স্কুল কোচ এস এ গণি তাকে অনুপ্রাণিত করলেন। হায়দ্রাবাদের আলিয়া হাই স্কুলের হয়ে ৬৭ ও ৬৮-তে সে সুব্রত মুখার্জি কাপ খেলল, ৬৯-এ খেলল সিটি মিডল স্কুলের হয়ে। সর্বভারতীয় স্কুল গেমসে অন্ধ্রপ্রদেশ স্কুল ফুটবল দলের হয়েও সে খেলল। ৭০ ও ৭১ সালে জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে সে সুযোগ পেল অন্ধ্রপ্রদেশ দলে। এর আগেই সে যোগ দিয়েছে হায়দ্রাবাদ আর্সেনাল ক্লাবে। ৭১-এ চলে এল অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ দলে। সাব্বিরের উত্তরণ ঘটছে। এই দলের হয়ে সে রোভার্স খেলল, ডুরাণ্ড খেলল। গোল করল। কাচা গলি থেকে উঠে এসে ফুটবলের রাজপথ দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছে সে। ৭৩-এ সাব্বির চলে এল বোম্বেতে। সেখানে ওর অনেক আত্মীয়স্বজন থাকে। চাকরি নিল টাটায়। এবং খেলতে আরম্ভ করল টাটা স্পোর্টস ক্লাবের হয়ে। ৭৭ পর্যন্ত সেখানে খেলল। এই ফাঁকে কলকাতার তিন প্রধানই তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কলকাতায় খেলার শখ কার না থাকে! কিন্তু ঘটনাচক্রে এতদিন সে আসতে পারেনি। অবশেষে গতবছর, সে যোগ দেয় ইস্টবেঙ্গলে।

শেষমেশ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকেই বেছে নিলে কেন? —ইস্টবেঙ্গল আমাকে পাবার ব্যাপারে খুব আগ্রহ দেখিয়েছিল। আর এই ক্লাবের টিম স্পিরিটকে আমি খুব লাইক করি। এখানে আসার আগে কলকাতা ফুটবলের চার্ম আমাকে দোলা দিত।

বেশ কয়েকজন কোচের কাছে সাব্বিরের পরিমার্জন হয়েছে। তারা ঃ হাকিম (রহিম সাহেবের পুত্র), সালাম, বাসা এবং অবশ্যই অরুণ ঘোষ। পি কে-র ডাইরেক্ট কোচিং সে এখন পর্যন্ত নেয়নি।

আমরা দেখলাম '৭৮-এ সাব্বির ইস্টবেঙ্গলে এল এবং প্রায় পুরো লিগ সিজনটা বসে রইল। তারপর খেলল। গত বছর ইস্ট-বেঙ্গল লিগ-শিল্ড কোনটাই দখল করতে পারেনি। কিন্তু ঘরে তুলেছে বরদলুই ও ডুরাণ্ড কাপ। এবারও ইস্টবেঙ্গল লিগ ও শিল্ড পেল না। সাব্বিরের কথায়—ইস্টবেঙ্গলের ৭৯-তে লিগ না পাওয়ার পিছনে রয়েছে মন্দভাগ্য।

সাব্বির আড্ডা মারে ওয়েলিংটনের মোড়ে বিশ্বনাথ পেট্রল পাম্পে, ওয়াই এম সি এ হোস্টেল থেকে যার দূরত্ব মাত্র মিনিট দু'য়েকের। ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু মীর সাজ্জাদ, শ্যামল ঘোষ, উলাগানাথন, সুরজিত সেনগুপ্ত। সদা হাসিখুশী ও ছটফটে যুবক ডেভিড উইলিয়ামসও মাঝে মাঝেই এখানে আসে। সেদিন সন্ধ্যাতেও মাথায় সেই টুপিটি পরে এসেছিল। এসেই আসর মাতিয়ে তুলতে ডেভিডের সময় লাগল না।

সাব্বির ৭৩-এ দুবার ইস্টবেঙ্গলের জালে বল ঢুকিয়েছে। প্রথমে ডি সি এম, পরে রোভার্সে। এখানে খেলতে আসার পর থেকে মহারাষ্ট্রের এক সময়ের এই নামী স্ট্রাইকার সম্পর্কে দর্শকরা বলছেন, কখনো ভালো, কখনো মাঝারি, আবার কখনো বা মন্দ। আসলে এই ভালো-মন্দ আর কখনো মেঘ, কখনো রোদ নিয়েই মানুষের জীবন। একজন ফুটবলারও তাই। এই দ্বৈত প্রাপ্তি ও মিশ্র অনুভূতি নিয়ে তাদের চলতে হয় মাঠের মধ্যে, বাইরেও। সাব্বিরও এই 'আপ্স অ্যাণ্ড ডাউনস' মাড়িয়েই এগিয়ে যাচ্ছে।

৭৩ থেকে এখন পর্যন্ত পারফরম্যান্সের বিচারে সাব্বির জাতীয় ফুটবলে, গতবার ছাড়া কখনো বাদ যায়নি। দেখা যাক, এবার সে বাংলা দলে সুযোগ পায় কি না। তবে অনেক ফুটবল বিশেষজ্ঞই এবারের বাংলা দল গঠন করতে গিয়ে সাব্বিরের নামটি 'কমন' রেখেছেন। ●

জামশেদপুরে ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ

['জামসেদপুরে ফুটবল এখন শুধন অবস্থায়' শীর্ষক একটি লেখা গত ২০ জুলাই আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দূর্ভাগ্যবশত ওই লেখার মধ্যে কিছু ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সঠিক তথ্য সম্বলিত সংশোধনী প্রকাশ করা হল।]

জামসেদপুর ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা জে এস এ। এই সংস্থার সভাপতি এইচ পি বোধনওয়ালা ও সম্পাদক জি এম অ্যানি। জামসেদপুর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের ফুটবল সাব কমিটির চেয়ারম্যান পি এস রাও ও অ্যাসিস্ট্যান্ট জয়েন্ট সেক্রেটারি তাতা রাও। তাতা রাও গত ১৩ সেপ্টেম্বর এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, গত বছর লিগ ফুটবল দ্রুত গতিতে চলাকালীন টেলকো বনাম মহঃ স্পোর্টিং-এর খেলায় হঠাৎ রেফারি মাঠে গরহাজির হন। দর্শকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে ও মাঠে ভাঙচুর করে। ফলে সেদিনের খেলা ভণ্ডুল হয়ে যায়। এর পর রেফারি-সংস্থার পক্ষ থেকে পরবর্তী খেলাগুলি পরিচালনার কোন গ্যারান্টি না পাওয়ায় জে এস এ লিগ ফুটবল পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। এবছর এখনো পর্যন্ত লিগ হতে পারেনি। এর প্রধান কারণ দাঙ্গা হাঙ্গামার জের। গত এপ্রিল ও আগস্ট মাসে ইস্পাত নগরীতে দাঙ্গার ফলে জে এস এ পরিচালিত ফুটবল লিগ এখনো শুরু করা যায়নি।

এ বছর জে এস এ পরিচালিত ফুটবল লিগে প্রথম ডিভিসনে ১২, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিভিসনে যথাক্রমে ৮ ও ৯টি দল অংশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। স্থানীয় প্রাচীন ফুটবল ক্লাব-গুলির মধ্যে অন্যতম অক্স ক্লাব। এটি ১৯২৩ সালে রেজেস্ট্রিভুক্ত হয়। এর পরই মহঃ স্পোর্টিং। সাকচি এ সি ও জামসেদপুর ওল্ড বয়েজ ক্লাব দুটি জে এস এ-র স্বীকৃত সংস্থা নয়। সাকচি ক্লাব এখন তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হিমসিম খাচ্ছে। এরা এখন ছোট ছেলেমেয়েদের ড্রিল, পি টি, খেলাধূলা শেখায় বলে জানালেন জে এস এ-র তাতা রাও।



কার্টুন ঃ আলি

আই এফ এ কিভাবে ফুটবলার তৈরি করছে

সংবাদদাতা : আমাদের দেশে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ উঠতি ফুটবল খেলোয়াড় খুঁজে বার করে তাদের আরও ভালভাবে গড়ে তুলে ফুটবলের মান উন্নয়নের জন্য কোনও বাস্তবসম্মত ফলপ্রসূ পরিকল্পনায় ভারতীয় ফুটবলের কর্তাব্যক্তিরা খুব একটা মাথা ঘামাননি। ওই কর্তাব্যক্তিদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন তখনই হয় যখন ভারতীয় দলের দেশের বাইরে কোথাও খেলতে যাবার পরিকল্পনা থাকে। তখন ওরা নিজেদের পছন্দ–মাফিক নামকাওয়াস্তে লোক দেখানো প্রশিক্ষণ শিবির খুলে ভারতের প্রথম সারির ফুটবলারদের মধ্যে থেকে 'কোটা' ভিত্তিক খেলোয়াড় নিয়ে দলগঠনের পর তাদের কর্তব্য শেষ করেন। ফলে ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান চিত্রটি কি? তা সবাই জানেন।

অথচ বিশ্বে যে কটি দেশের ফুটবলে নাম ডাক আছে, তাদের খ্যাতির পিছনে আছে ওই দেশগুলির ফুটবল প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের বহু গঠনমূলক বাস্তব পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাগুলি তারা এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই রচনা করেন যে কোনও ফলের ছোট চারা গাছকে পুঁতে যদি সযত্নে লালন পালন করে বড় করা হয়, অদূর ভবিষ্যতে সেই গাছ থেকেই ভাল ফল পাওয়া যাবেই। সুখের কথা এই বিশ্বাসটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন আই এফ এ-র কিছু কর্তাব্যক্তি। তাই তারা দেশের সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের ঘিরে কিছু পরিকল্পনা করেছেন।

এমনই এক পরিকল্পনার কাহিনী শোনালেন আই এফ এ-র প্রাক্তন সহ সম্পাদক দিলীপ ঘোষ। ১৯৬৭, জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরুর কয়েকমাস আগে। অতএব প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বাংলা দলের দল গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রয়োজন। পরিকল্পনাটি মনের মধ্যে ছিল এই সুযোগে রূপ দেওয়ার। প্রশিক্ষণ শিবিরটিকে এমনভাবে চালাতে হবে, যাতে রথ দেখা ও কলা বেচা দুই-ই হবে। অর্থাৎ বাংলা দল গঠনও হবে এবং শিবিরে যে ছেলেরা থাকবে তাদেরও ভালভাবে খেলা শেখান হবে, যাতে তারা নিজেদের খেলার দক্ষতাকে আরও বাড়াতে পারে। এই পরিকল্পনার রূপকাররা অর্থাৎ আই এফ এ-র তদানীন্তন সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত, দিলীপবাবু এবং আই এফ এ-র আরও কর্তাব্যক্তিরা এগিয়ে এলেন পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য।

কিন্তু এই মহৎ প্রচেষ্টাকে দাঁড় করাতে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল অর্থ। এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির চালাতে প্রায় তিরিশ হাজার টাকার প্রয়োজন মহৎ প্রচেষ্টা যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট না হয় তার জন্য এগিয়ে এলেন তদানীন্তন আই এফ এ-র সভাপতি স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, তিনি আই এফ এ-র জেনারেল ফাণ্ড থেকে সাতাশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করলেন। আর্থিক বাধা দূর হল। শিবিরের জন্য মাঠের ব্যবস্থা হল রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম ভাড়া করে। শিবিরে যোগদানের জন্য প্রত্যেক ক্লাবকে চিঠির মারফৎ অনুরোধ জানান হল সতের বছরের অনূর্ধ্ব ছেলেদের পাঠানোর জন্য। এইবার অবাক হবার মতন ঘটনা ঘটল প্রায় তিনশ থেকে সাড়ে তিনশ ছেলে মাঠে হাজির হল। সমস্যায় পড়লেন শিবির পরিচালকেরা, সঙ্গে প্রশিক্ষকরা অর্থাৎ অচ্যুত ব্যানার্জি, সুভাষ সাহা ও প্রভাত নাথ। যাহোক শিবির শুরুর প্রায় দু'সপ্তাহ পরে ওই ছেলেদের মধ্যে থেকে ষাট জনকে বাছাই করা হল। ওই ষাট জনের মধ্যে থেকে তিরিশ জনকে বাছাই করা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল প্রশিক্ষকদের কাছে। কারণ, ছেলেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা, প্রত্যেকে চেষ্টা করছে ভাল খেলে শেষ তিরিশ জনের মধ্যে থাকার। ওদের মধ্যে গুণগত উৎকর্ষতার পার্থক্য তখন ছিল উনিশ–বিশ। প্রশিক্ষকেরা ওর মধ্যে থেকেই তিরিশ জনকে বেছে নিলেন অনেক পরীক্ষা করার পর। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার যারা বাদ গিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল তরুণ বসু ও গোবিন্দ গুহঠাকুরতার মতন খেলোয়াড়। আবার সুভাষ ভৌমিক, স্বপন সেনগুপ্ত, সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারের মতন খেলোয়াড়রাও শেষ তিরিশ জনের মধ্যে ছিল। এই শিবির থেকেই আবিষ্কার বেঙ্গল সকার লিগের একটি ক্লাব থেকে আগত নিমাই গোস্বামী, রঞ্জিত দে ও অনুপ ঘোষের মতন খেলোয়াড়। এই শিবিরের শতকরা ৯৫ জন ভারতের জার্সি গায়ে চাপিয়েছে। খেলার পর টিফিনের ব্যবস্থা ছিল দুটো ডিম, দুটো কলা, মাখন সহ পাউরুটি, দুধ, ছোলা ও গুড়। শিক্ষার্থীরা যেমন প্রচণ্ড পরিশ্রম করত, তাদের সঙ্গে সমান তালে পরিশ্রম করতেন প্রশিক্ষকরাও। মাঝে মাঝে ভোর বেলায় এসে তাদের বাড়ি ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যেত। কারণ চার ঘণ্টা প্র্যাকটিসের পর সমস্ত গুছিয়ে রাখতে; পরের দিন যাতে অসুবিধে না হয় তার জন্যও সব কিছু প্রস্তুত করতেন তারা। ওরা হাসিমুখে এই কাজগুলি করতেন প্রশিক্ষণ শিবিরকে ভালবেসে, এবং এই আশায় যদি ছেলেরা ভবিষ্যতে ভাল খেলোয়াড় হয়ে, পড়ে মার খাওয়া ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাতে পারে। ১০০ দিনের ওপর চলার পর শিবির বন্ধ হয়ে গেল অজ্ঞাত কারণে। এর পরে জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করার জন্য দল গঠনের জন্য যে শিবির খোলা হত তাতে নামকরা খেলোয়াড়রাই আসত আর নম নম করে দল গঠন করা হত, ওই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা ছিল না।



প্রশিক্ষক অচ্যুৎ ব্যানার্জি / শঙ্কর নাগ দাস

১৯৭৮, দীর্ঘ এগারটি বছর, আই এফ এ-র কর্মসমিতিরও পরিবর্তন ঘটল। এলেন নতুন সম্পাদক অশোক ঘোষ। তিনি অনেক গঠনমূলক পরিকল্পনায় হাত দিলেন। ওরই মধ্যে ছিল ফুটবলের মান উন্নয়নের জন্যও কিছু প্রস্তাব ও পরিকল্পনা। ১৯৭৭ থেকে জাতীয় সাব জুনিয়র প্রতিযোগিতার জন্য, ১৫ বছরের অনূর্ধ্বের ছেলেদের নিয়ে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ করল, উদ্দেশ্য নতুন প্রতিভা খুঁজে বার করা। ভারতে এই ধরনের প্রতিযোগিতা বেশ সাড়া জাগাল। প্রতিযোগিতায় যোগদানের আগে বাংলা দল গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হত প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে যাবার পর ওই শিবির গুটিয়ে নেওয়া হত।

কিন্তু শিবিরের প্রশিক্ষণরত ছেলেদের অনেকের মধ্যে প্রতিশ্রুতি জাগবার সম্ভাবনা ছিল, প্রতিযোগিতার পর ওদের ধরে রাখার এমন কোনও পরিকল্পনা ছিল না যাতে ওদের প্রশিক্ষণের আরও সুযোগ দিয়ে বড় করা যায়।

তাই বর্তমান সম্পাদক অশোক ঘোষ ও তার সহযোগীরা ঠিক করলেন এই ধরনের



প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ক্ষুদে ফুটবলারদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে তাদের আরও ভাল করে তৈরি করা। পরিকল্পনা শুরু হল ১৯৭৮ সাল থেকে। রেড রোডের ধারে ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান মাঠের পূর্বদিকে আই এফ এ-র নিজস্ব মাঠে এক দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়। আই এফ এ-র বর্তমান সহকারী সম্পাদক চণ্ডী দাস বললেন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির মারফৎ প্রায় শ'দুয়েক ছেলে শিবিরে যোগদানের জন্য এসেছিল, ওদের মধ্যে তিরিশ জনকে রাখা হল বাংলা দল গঠনের জন্য, প্রশিক্ষকরা ছিলেন অচ্যুত ব্যানার্জি, মনীষ সরকার,, অমৃত চক্রবর্তী, ভুবন মিত্র, বিভূতি মজুমদার। শিক্ষার্থীরা যাতে আরও বেশী খেলার সুযোগ পায় তার জন্য ১৯৭৮ থেকে আই এফ এ শুরু করল সাব-জুনিয়র লিগ, মোট সাতটি দলকে নিয়ে এই লিগ শুরু হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যয় মেটাতেন আই এফ এ। ১৯৭৯ থেকে আরও বৃহদাকারে, আরও গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ করার জন্য আরও এক ধাপ এগোলেন আই আই এফ এ-র কর্তৃপক্ষ। ফিফা পরিচালিত 'কোকাকোলা স্কিম'-এর পরিকল্পনার মতন প্রশিক্ষণ শিবির খোলার প্রচেষ্টা আই এফ এ নিল। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করার জন্য এগিয়ে এল হরলিক্সের উৎপাদক সংস্থা। তারা চল্লিশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষাঙ্গিক ব্যয় ভার মেটানোর জন্য। হরলিক্সের নামানুসারে প্রশিক্ষণ শিবিরের নাম হল 'হরলিক্স কোচিং ক্যাম্প।'

১৯৭৮ সালে কিছু ছেলে বয়স পেরিয়ে যাওয়াতে বাদ গেল, যারা রইল তাদের সঙ্গে ১৯৭৯ সালের শ'দুয়েক ছেলের মধ্যে বাছাই করে তিরিশজনকে নিয়ে শুরু হল 'হরলিক্স কোচিং ক্যাম্প'। বর্তমানের তিরিশজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে আগামী দু'বছরে এই শিবিরে আরও ষাট জনকে নেওয়া হবে অর্থাৎ বছরে তিরিশজন করে। মোট নব্বই জনকে এই তিন বছরে প্রশিক্ষণ শিবিরে খেলা শেখবার সুযোগ দেওয়া হবে। এই তিন বছরে শিক্ষার্থী-দের বয়সের গড়পড়তা দাঁড়াবে ১৫ থেকে ১৮-র মধ্যে। ওদের শিক্ষার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে বিভিন্ন ক্লাবে খেলার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। এই কোচিং ক্যাম্পের প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষক অচ্যুত ব্যানার্জির ওপর।

মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবারের যে কোনও একদিন সকাল বেলায় আই এফ এ-র মাঠে যান, —দেখতে পাবেন—ছোটরা কি রকম আগ্রহের সঙ্গে অচ্যুতবাবুর কাছে খেলা শিখছে। ছোটরা শেখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে, তাদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেছেন ছোট খাটো, মাথায় পাকা চুল প্রবীন মানুষটি। ভুল হলেই 'স্যার' বকাবকি করছেন, আবার সেই 'স্যার' পরে স্নেহের আবেশে জড়িয়ে ভুলগুলি শুধরে দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণ শুরু সকাল সাতটা থেকে। শেষ সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে। খেলার পর টিফিন দেওয়া হয় দুটো ডিম, দুটো কলা,দশগ্রাম মাখন সহ কোয়ার্টার পাউণ্ড রুটি, মাঝে মধ্যে পরিবর্তনের জন্য একটা ডিমের বদলে সন্দেশ দেওয়া হয়। এই কোচিং স্কিম সম্বন্ধে চণ্ডীবাবু জানালেন, প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ক্ষুদে ফুটবলার খুঁজে বার করার জন্য এই বছরে সাব জুনিয়র লিগে মোট ঊনত্রিশটি দল নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি দুঃখের সঙ্গে এও জানালেন, যে উদ্দেশ্যে নিয়ে এই লিগ, তা পূর্ণ হচ্ছে না, কারণ আই এফ এ-র কঠোর নির্দেশ সত্ত্বেও লিগের কয়েকটি দল খেলার বদলে ট্রফি জেতাটাকে মুখ্য উদ্দেশ্য ধরে নিয়ে ১৫ বছরের ওপরের ছেলেদের খেলাচ্ছে। ফলে খেলা নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠেছে। তিনি বললেন, অনেক সময়ে মনে হয় বয়সের এই ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্য লিগ খেলা বন্ধই করে দিই।

শিবিরের ছেলেদের খেলার সুযোগ বাড়াবার জন্য ওদের নিয়ে জেলায় জেলায় খেলান হচ্ছে, ইতিমধ্যে এগারটি খেলা হয়েছে। সাতটিতে জিতেছে, বাকী দুটি অমীমাংসিত। এদের নিয়ে জেলায় জেলায় ওপেন টুর্নামেন্টে খেলাবার পরিকল্পনা আই এফ এ-র আছে ওদের অভিজ্ঞতা বাড়াবার জন্য।

ইতিমধ্যে ময়দানের ফুটবল মরশুম শুরু হওয়ার আগে ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে একটি অনুশীলনী খেলা খেলেছিল, যদিও ওরা হেরেছিল, কিন্তু ভাল খেলেছিল। ওরা উৎসাহের সঙ্গে জানাল ভারতের শ্রেষ্ঠ উইংগার সুরজিত সেনগুপ্ত একদিন ওদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করেছিলেন, এইভাবে মানস, বিদেশ, মনোরঞ্জন, চিন্ময়, ভাস্কররা ওদের সঙ্গে যদি মাঝে মধ্যে খেলেন, তাহলে ফল ভালই হবে।

টোকিওর ফলে বাহাদুর খুশি হননি

অমল ত্রিবেদী ঃ ভারতের কৃতি অ্যাথলিট বাহাদুর সিং চৌহান গত মে মাসে টোকিওর এশিয়ান ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড মিটে বাহাদুর ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। টোকিওর ফলে মোটেই খুশি নন। তার আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণপদকটি হাতছাড়া হয়ে গেছে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে খুশি থাকতে হয়েছে বাহাদুরকে। সট পাট ছুঁড়েছেন ১৭·৪৭ মিটার দূরে। অথচ ব্যাঙ্ককে এশিয়ান গেমসে তিনি ১৭·৬১ মিঃ ছুঁড়ে সোনা পান্।

বাহাদুর জামসেদপুর টেলকো'র কর্মী। ১৯৬৬ সালে টেলকোয় তিনি 'জয়েন' করেন। প্রথমে তিনি ছিলেন সুপার ভাইজার। গত এশিয়াডে সাফল্যের পর এখন তার পদোন্নতি হয়েছে। এখন তিনি টেলকোয় ফোরম্যান। সকালে দু'ঘণ্টা ও বিকালে দু'ঘণ্টা অনুশীলন করেন নব নির্মিত টেলকো স্টেডিয়ামে। এখানে প্রথম থেকে তার কোচ এস গুজরাটি।

বাহাদুর হরিয়ানার ছেলে। জন্ম আটই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬/ হরিয়ানার সুরতিয়া গ্রামে। বাবা এস কে এস চৌহান ছোট থেকে ছেলের খেলাধূলার দিকে নজর দেন। স্কুল জীবন কাটে কালানওয়ালি সরকারী হাই স্কুলে। তারপর অমৃতসরে খালসা কলেজে। ১৯৬৩ সালে জলন্ধর স্পোর্টস কলেজে ভর্তি হন বাহাদুর সিং।

বাহাদুরের স্পোর্টস জীবনের সূত্রপাত ১৯৬৫ সালে। সেবার মাদ্রাজে আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ায় ডিসকাসে তিনি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। পরে বাহাদুর সিং ডিসকাস ছেড়ে সটপাটে আত্মনিয়োগ করেন। সটপাটকে ডিসকাস ছোঁড়ার ভঙ্গিতে প্রথম ছোঁড়েন্ তিনি। এশিয়ায় এভাবে এর আগে আর কেউ-চেষ্টা করেননি। এই পদ্ধতিতে তিনি সাফল্য পান অদ্ভুত রকমের। এখন তার আবিষ্কৃত পদ্ধতি সারা এশিয়া মহাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই পদ্ধতিকে বিশেষজ্ঞরা 'ডিসকোপাট টেকনিক' নাম দিয়েছেন।

১৯৬৬ সালে জামসেদপুরে আসার পর তার ক্রীড়া জীবনের স্বর্ণোজ্জল দিনগুলির আবির্ভাব ঘটে। এবছর থেকেই তিনি সটপাটে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন। আজো সে ধারা অব্যাহত। ৭৩ সালে তিনি ম্যানিলা এশীয় ট্র্যাক এ্যাণ্ড ফিল্ড মিটে সটপাটে ব্রোঞ্জ পান। '৭৪ সালে এশীয় ক্রীড়ায় তেহরানে তিনি রূপো পান। '৭৫-এ সিউলে এশিয়ান ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ডে সোনা পান ১৭.৭০ মিঃ দূরে সটপাট ছুঁড়ে। এবছর ম্যানিলাতে সপ্তদেশীয় আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্সে সোনা পান আবার। '৭৬ সালে ৬০ ফুটের উপর সটপাট ছোঁড়েন। এরপর আরো কয়েকবার এই দূরত্বে তিনি সটপাট ছুঁড়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তার তৈরি এশিয়ান রেকর্ড ১৭.৭০ মিঃ। '৭৭ সালে ডুসেলডর্ফে প্রথম বিশ্বকাপ অ্যাথ-লেটিক্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেবার তিনি সপ্তম হয়েছিলেন। ৭৮-এ ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে সটপাটে সোনা পান ১৭.৬১ মিঃ ছুঁড়ে। এবছর এডমণ্টন কমনওয়েলথ ক্রীড়াতেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। '৭৯ সালে তিনি টোকিওতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড মিটে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি ব্রোঞ্জ পান সেখানে।

টোকিওতে তার অকৃতকার্যতার কারণ হিসাবে বাহাদুর জানালেন—ঠিক টোকিও রওয়ানা হওয়ার আগে পারিবারিক কাজে স্ত্রী-কন্যা সহ সারসা গিয়েছিলাম। রাত্রে বাসে দিল্লি আসার পথে আমি দুর্ঘটনার কবলে পড়ি। বাসটি উঁচু রাস্তা থেকে গড়িয়ে নীচে খাদে এসে পড়ে। ডান হাতের রিস্টে আঘাত পাই। পরদিন দিল্লি হাসপাতালে চিকিৎসা করাই। এরপর টোকিও গিয়ে অংশ নিতে পারব, ভাবিনি। শুধু মনের জোরকে ভরসা করে সেখানে যাই এবং হাতের ব্যথা নিয়েও ব্রোঞ্জ পাই।

এবছর পাতিয়ালা থেকে অ্যাথলেটিক্সের এন আই এস প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। সময়াভাবে ছেলেদের কোচিং দিতে পারছেন না। ভবিষ্যতে কোচিং দিতে আগ্রহী তিনি, জানালেন বাহাদুর সিং। '৭৬ সালে ভারত সরকার প্রদত্ত অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন বাহাদুর। ৯৮ কি গ্রা ওজনের এই সটপাটার জানালেন—সাধারণ অন্য দু পাঁচজনের মতই আহার তিনি গ্রহণ করেন। নিয়মিত অনুশীলনই তার সাফল্যের প্রধান অস্ত্র।

সিণ্ডার ট্র্যাকে অনুশীলন করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এখন আমাদের টার্টান ট্র্যাক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে, এর ফল কিন্তু ভাল হচ্ছে না। টোকিওতে এর ফল হাতে হাতে পেয়েছে ভারতীয় দল। বিশ্ব ক্রীড়ায় ভাল ফল করতে হলে, আমাদের অবিলম্বে বিদেশ থেকে টার্টান ট্র্যাক আনিয়ে তাতে অনুশীলন করতে হবে, বললেন বাহাদুর সিং, ভারতের অধিনায়ক।

আমাদের ভাবী অ্যাথলিটদের সম্পর্কে বাহাদুর সিং-এর মতামত স্কুল-কলেজ থেকেই ছেলেদের আরো কঠোর অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। বিদেশে ছোট ছেলেরা স্কুলে ভর্তি হলে তাদের শিক্ষা ও খেলাধূলার উপর সম পরিমাণ নজর দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের দেশে তা হয়না। স্কুল কলেজগুলি যতই খেলাধূলা নিয়ে মাতামাতি করুক না কেন, কাজের কাজ তাতে কিছুই হচ্ছে না। আমাদের ছেলেদের আরো সুযোগ দিতে হবে। আর দরকার তাদের উপযুক্ত মানের প্রশিক্ষণ ও আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম।

বাংলার কৃতি অ্যাথলিট রীতা সেন সম্পর্কে বাহাদুর খুব উৎসাহী। বললেন—ভাল করবেই। কলকাতা ময়দানে পাঞ্জাব থেকে গুরদেব, হরজিন্দর সিংদের মত ফুটবলারদের আনিয়ে তাদের পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। অথচ রীতা সেনদের মত মেয়েরা সামান্য টাকাও অ্যাথ-লেটিক্স থেকে পাচ্ছে না, এজন্য বাহাদুরকে সত্যিই চিন্তিত মনে হল। তার মতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদের মত অ্যাথলিটকে কিছু আর্থিক সাহায্য দিলে এরা উপকৃত হবে আর তা দেখে অন্যরাও উৎসাহিত হবে। ভবিষ্যতে আরো ভাল ফল করার চেষ্টা করবে এরা।



বাহাদুর সিং

বাঙ্গালোরে মাদ্রাজের পুনরাবৃত্তি • বাঙ্গালোর থেকে আর অরবিন্দম

মাদ্রাজে যা হয়েছিল আবার অস্ট্রেলিয়নরা তাই করে বসল। দু-একজন মাত্র ঘূর্ণি বলের বিরুদ্ধে দাপট দেখালেও, বাঙ্গালোরের টেস্টেও ড্র করে তারা ভারতীয়দের এগিয়ে যেতে বাধা দিল। পরপর দু'বার। টসে আবার কিম হিউস জয়ী হলে তার খেলোয়াড়রা মাদ্রাজের মতোই কোনোরকমে তিনশ রান অতিক্রম করতে পেরেছিল। ওই রান সংখ্যাটাই যথেষ্ঠ ছিল অস্ট্রেলীয় স্পিনার জিম হিগস ও শেষ মুহূর্তের পছন্দ ব্রুস ইয়ারডলির পক্ষে। তারা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের খুশিমাফিক রান তুলতে না দিতে যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।

তৃতীয় দিনে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা জবুথবু থাকাতে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে তো এগোতে পারলোই না বরং তাদের বেশ ঘাম ঝরিয়ে চলতে হল। ভাগ্যিস বৃষ্টি এসে গেছলো! অন্যথায় সবার মনেই একটা কথাই ঘুরে ফিরে গোমরাচ্ছিল বোধহয় আড়াইশো অথবা তারও কমে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যাচ্ছে। দুই অস্ট্রেলিয় স্পিনারই এমন নিখুঁত বল করে যাচ্ছিল।

যাই হোক, চতুর্থ দিনে ভারত আবার ম্যাচটি তাদের পক্ষে আনতে পারলো দিলীপ বেঙ্গসরকরের নিজস্ব ভঙ্গিতে রান সংগ্রহের পথে ফিরে আসায়। তার ব্যাটরূপী হাতুড়িটি যথেচ্ছ অথচ ব্যাকরণসম্মত প্রয়োগে একটা মনে রাখার মতো সেঞ্চুরি এখানকার দর্শকদের উপহার দিল। সঙ্গে গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের অপরাজিত সেঞ্চুরি, অবশ্য তার জীবনের নিকৃষ্টতম সেঞ্চুরি। 'ভিস' ব্যাট ঠিকমত চালাতে দ্বিধা করছিল, যখন তখন খোঁচা মারছিল এবং ব্যাটে-বলে মিলনের সময়ের গড়মিল করে ফেলছিল। তার যে মার বলটিকে কভারে নিয়ে যাওয়ার কথা, সেই বল তখন চলছিল স্কোয়ার লেগ অথবা ফাইন লেগ বাউণ্ডারির পথে।

এদিন বেঙ্গসরকর আউটের পর কপিলকে গাভাসকর কেন পাঠাল না, জানা নেই। যশপাল এসে কিছুক্ষণ এমন ব্যাট করেছে যেন ভারত খেলছে ম্যাচ বাঁচানোর জন্যে। ফলে সময়ের গতির সঙ্গে আবার তাল হারিয়ে গেল। দীর্ঘ সময় রান না আসায় দর্শকদের বিরক্তি ধরে গেল।

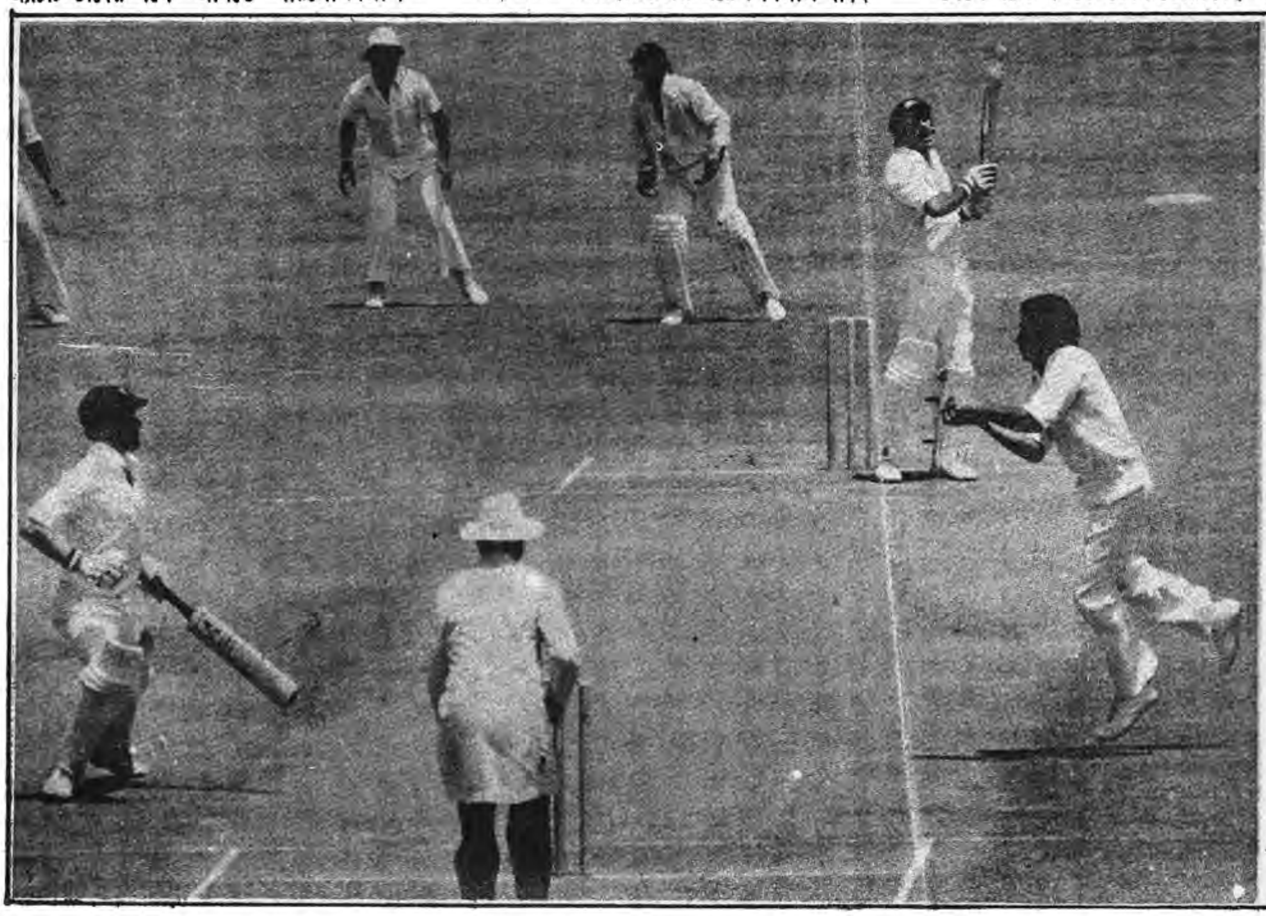
শেষদিনে এক ঘণ্টায় একাশি রান করে ভারত যেন 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে' দেখাতে চাইলে। মধ্যাহ্নভোজের পরে শিবলাল যাদব অস্ট্রেলীয়দের যখন কব্জায় আনা শুরু করেছে শেষ ইনিংসের তিনটি উইকেটই তার নতুন ঝুলিটাতে পুরে, তখন আবার বৃষ্টি অতিথি দলটিকে বাঁচালো।

ফলে এখন বড় কথা হয়ে দাঁড়াল ভারত যদি টসে জেতে এবং বড় ইনিংস গড়তে পারে তখনই জয় নিশ্চিত হতে পারে।

প্রথম দিন : হায়দ্রাবাদের অফ স্পিনার টেস্ট দলে স্থান করে নিল। আহত যজুর্বেন্দ্র সিং-এর স্থানে ডেকে আনা কর্ণাটকের অল-রাউণ্ডার রোজার বিনী দ্বাদশ ব্যক্তি হলো।

অস্ট্রেলিয়া ফাস্ট বোলার ডাইমককে দ্বাদশ ব্যক্তি করে অফ স্পিনার ইয়ারডলিকে আনল। আর হোয়াটমোর বাদ গিয়ে ওপেনার রিক ডার্লিং আবার দলে ঢোকার সুযোগ পেল।

শুরুতেই ৯৫ মিনিট সময় নষ্ট হয়েছিল এদিন বৃষ্টির জন্যে। *বাকি ২৫ মিনিট ডার্লিং আর হিলডিচ অবিচ্ছিন্ন থাকল। যদিও মধ্যাহ্নভোজের আগের ওভারে বল করতে এসে দোশি ওদের বেশ কোণঠাসা করে। কপিলের একটা ভীষণ দ্রুত বল ডার্লিং-এর লেগ স্টাম্প উড়িয়ে দিলেও বর্ডার-হিলডিচ জুটি বলতে গেলে ফাস্ট বলকে কোন তোয়াক্কাই করেনি।



দ্বিতীয় দিন যজুর্বিন্দ্রর বলে তাঁরই হাতে আউট হচ্ছেন ইয়ার্ডলি

কিন্তু দোশিকে বাজে মার মেরে বর্ডার যাদবকে প্রথম টেস্ট ক্যাচ সহজে ধরার সুযোগ দিল এবং উদ্বুদ্ধ যাদব পরপর হিলডিচ ও ইয়ালোপকে বোকা বানালো। হিলডিচ লং অফে তাকে চামচে মার মারলো যেখানে অরুণলাল যেন এই ক্যাচটি পাবে বলেই অপেক্ষা করছিল। ইয়ালোপ শেষ মুহূর্তে বাঁক নেয়া বল খোঁচা মেরে একমাত্র স্লিপ-ফিল্ডার বিশ্বনাথের হাতে ধরা পড়ল। ৪ উইকেটে ১৮২ নিয়ে অতিথিরা দিন শেষ করল। তবে অধিনায়ক হিউস আর ইয়ারডলি সম্ভাবনার কথা জানিয়ে অপরাজিত রইল।

পরদিন দর্শকদের আশা এই দুই ব্যাটসম্যান পূরণ করে। কিন্তু দ্বিতীয় নতুন বলে ঘাউড়ির একটি সামান্য বাম্প হয়ে আসা বল পুল করতে গিয়ে ইয়ারডলি যখন বোলারের হাতেই ধরা পড়লো তখন অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ৫ উইকেটে ২৫৮। মধ্যাহ্ন ভোজের পর কিরমানি ঝাঁপিয়ে পড়ে উঁডের ক্যাচ নিয়ে তার যোগ্যতা পুনরায় প্রমাণ করে ঘাউড়িকে দ্বিতীয় উইকেটটি পাইয়ে দিল। কপিলের বলে গালিতে ঘাউড়ি হিউসকে ধরলো। ভেঙ্কট হগকে আর যাদব হিগস ও হার্স্টকে পেলো।

৩৩৩ রানে ইনিংস শেষ হলেও শেষ এক ঘণ্টায় গাভাসকর আর চৌহানের উইকেট পেয়ে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা বেশ খুশি খুশি হয়ে হোটেলে ফিরল। পরদিন বিশ্রাম। দুই ভারতীয় ওপেনারই ক্যাচ আউট হয়েছে ফাইন লেগে হিলডিচের হাতে ইয়ারডলিকে লেগ গ্লান্স করে। গাভাসকর ১০ রান করে, ফলে এই ৫২টি টেস্টে তার টেস্ট রান হয়েছে ৫০০৭। একমাত্র পাঁচ হাজারী ভারতীয় ব্যাটসম্যান। আবার কিরমানি এল নৈশপ্রহরী রূপে। ভারতীয় দল দু উইকেটে ৫৯। অপরপ্রান্তে সংগ্রামী বেঙ্গসরকর।

দ্বিতীয় দিনটির শেষ সময় এমন একটি কুৎসিৎ ঘটনা ঘটে যা ক্রিকেটের সম্মান-গর্ব ধূলায় লুটোয়। আম্পায়ার পাঞ্জাবী হগের পরপর তিনটি ডেলিভারি নো-বল ডাকেন। হগ গরম হতে শুরু করলো। হগকে হিউস অন্যপ্রান্তে আনলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হলো যখন রামস্বামী পরপর চারবার নো-বল ডাকলেন। হগ এরপর আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করলো এবং লাথি মেরে স্টাম্প মাটিতে ফেলল। কিন্তু বুদ্ধিমান হিউস এসে আম্পায়ারের কাছে ক্ষমা চাইলো এবং হগকে দিয়েও তাই করালো। এবং এরপরই হগকে প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সন্ধ্যায় ম্যানেজার মেরিম্যান সাংবাদিক বৈঠক ডেকে দলের হয়ে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, আম্পায়ারিং-এর উৎকর্ষতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠে না।



দ্বিতীয় টেস্টে অনবদ্য বিশ্বনাথ

তৃতীয় দিনে এক ঘণ্টা পর কিরমানি হিগের খোঁকায় স্টাম্পড হলো। ভারতের স্কোর ৩ উইকেটে ১২৪ রানে বৃষ্টির জন্য বন্ধ হলো। এদিন হগ আরও কম রানআপ নিয়ে ৫ ওভার বল করে, কিন্তু একটিও নো-বল হয়নি।

চতুর্থ দিনে বেঙ্গসরকর ও বিশ্বনাথ সেঞ্চুরি পেলো। উভয়ে চতুর্থ উইকেটে রেকর্ড ১৫৯ রান যোগ করার পর বেঙ্গসরকর দ্রুত রান তুলতে গিয়ে আউট হলো। বেঙ্গসরকর একবার মাত্র হগকে হুক করতে গিয়ে ভুল করে। কিন্তু হিউস ক্যাচ ধরতে না পারায় সে বেঁচে যায়। তার দর্শনীয় ব্যাটিং-এ দুটি ছয় আছে, দুটিই হগের বাউন্সারকে শায়েস্তা করে। ১২টি চারও আছে তার স্মরণীয় ১১২ রানে।

বিশ্বনাথ ৪১ রানে গালিতে খোঁচা দিয়ে হিলডিচের ব্যর্থতায় বেঁচে যাওয়ার পর সেই হিগসকেই লং অফ দিয়ে ছয় মারে। বিশ্বনাথের ব্যাটিং-এ ছয় মারা অস্বাভাবিক ঘটনা। এই ইনিংসের শতরানে 'ভিস' অবশ্য অনেক অস্বাভাবিক মারই মেরেছে। ইয়াশপাল বিশ্বনাথের শতরানের জন্য নিজেও রান নিচ্ছিল ধীরগতিতে। সে ৩৭ রানে আউট হয় ভারতের দিন শেষ হয় ৫ উইকেটে ৩৭৬ রানে।

শেষদিনে বেশ পিটিয়ে গাভাসকর যখন দান ছাড়ে তখন ম্যাচ মীমাংসা হবে না নিশ্চিত হয়ে গেছে। কিন্তু নবীন শিবলাল যাদব নিজের প্রথম ওভারেই হিলডিচকে লেগ বিফোরের ফাঁদে আটকায়, তখন ম্যাচ আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো।

মধ্যাহ্ন ভোজের ৩৫ মিনিট পর বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পর যাদব তার অসমাপ্ত ওভারের শেষ দুটি বল করতে এসে প্রথম বলেই বর্ডারকে বোল্ড করলো। বলটি মাটিতে বাউন্স করে হঠাৎ দ্রুত হয়ে ব্যাট প্যাডের মাঝের 'গেট' দিয়ে উইকেটে ঢুকে পড়ে। আবার যাদব উডকে 'ভিস' এর হাতে ক্যাচ আউট বাধ্য করে। তখন অস্ট্রেলিয়া

৩ উইকেটে ৬২। শিবলাল দু ইনিংসে ৮১ রানে ৭ উইকেট। কিন্তু জয়ের আশা ভারতের কাছে মরীচিকা হয়ে গেল যখন চা-বিরতির ১৫ মিনিট আগে প্রবল বর্ষণ দ্বিতীয় টেস্টের সমাপ্তি ঘটালো।

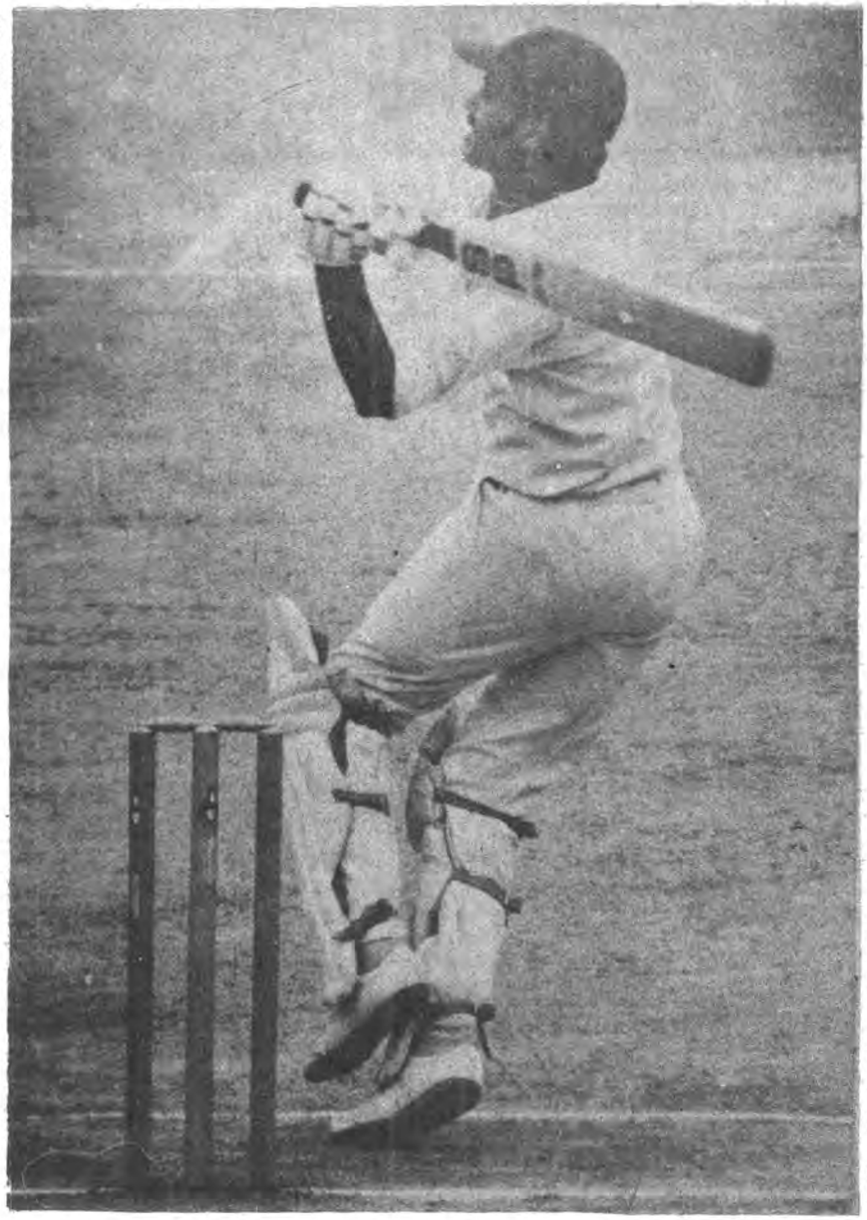
অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস

হিলডিচ ক অরুণলাল (পরিবর্ত) বো যাদব	৬২
ডার্লিং বো কপিলদেব	৭
বর্ডার ক যাদব বো দোশি	৪৪
হিউস ক ঘাউড়ি বো কপিলদেব	৮৬
ইয়ালোপ ক বিশ্বনাথ বো যাদব	১২
ইয়ার্ডলি ক ও বো ঘাউড়ি	৪৭
উড ক কিরমানি বো ঘাউড়ি	১৮
রাইট অপরাজিত	১৬
হগ এল বি ডবলিউ বো ভেঙ্কটরাঘবন	১৯
হিগস এল বি ডবলিউ বো যাদব	১
হার্স্ট বো যাদব	০
অতিরিক্ত	২১
মোট	৩৩৩

উইকেট পতন : ১/২১, ২/৯৯, ৩/১৩৭, ৪/১৫৯, ৫/২৫৮, ৬/২৯৪, ৭/২৯৪, ৮/৩৩২, ৮/৩৩২, ৯/৩৩৩।



শিবলাল যাদব—ব্যাঙ্গালোরে টেস্ট ক্রিকেটে হাতে খড়ি



হগের বলে হুক মারছেন বেঙ্গসরকর

ছবিগুলি পার্টিসিপেশন : ডি কে জ্ঞানচন্দানী

বোলিং : কপিলদেব ২৫-৪-৮৯-২, ঘাউড়ি ১৯-৫-৬৮-২, দোশি ২৮-৬-৬৩-১, ভেঙ্কটরাঘবন ২০-৬-৪৩-১, যাদব ২২.৫-৬-৪৯-৪।

ভারত প্রথম ইনিংস

গাভাসকর ক হিলডিচ বো ইয়ার্ডলি	১০
চৌহান ক হিলডিচ বো ইয়ার্ডলি	৩১
বেঙ্গসরকর এল বি ডবলিউ বো ইয়ার্ডলি	১১২
কিরমানি স্ট্যাঃ রাইট বো হিগস	৩০
বিশ্বনাথ অপরাজিত	১৬১
ইয়াশপাল ক বর্ডার বো ইয়ার্ডলি	৩৭
কপিল অপরাজিত	৩৮
অতিরিক্ত	৩৮
মোট (৫ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড)	৪৫৭

উইকেট পতন : ১/২২, ২/৬১, ৩/১২০, ৪/২৭৯, ৫/৩৭২।

বোলিং : হগ ৩২-৭-১১৮-০, হার্স্ট ২৯-৩-৯৩-০, ইয়ার্ডলি ৪৪-১৬-১০৭ ৪, হিগস ২৯-৯-৯৫-১, ইয়ালোপ ২-০-৬-০।

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস

উড ক বিশ্বনাথ বো যাদব	৩০
হিলডিচ-এল বি ডবলিউ বো যাদব	৩
বর্ডার বো যাদব	১৯
হিউস অপরাজিত	১৩
ইয়ালোপ অপরাজিত	৬
অতিরিক্ত	৬
মোট ৩ উইকেট	৭৭

উইকেট পতন : ১/১৩, ২/৫৩, ৩/৬২।

বোলিং : ঘাউড়ি ৩-১-৯-০, কপিলদেব ৩-২-১-০, ভেঙ্কটরাঘবন ৮-২-১৮-০, যাদব ১৫.৪-৪-৩২-৩, দোশি ৮-৪-১১-০।

(খেলা অমীমাংসিত)


ঘামাচির চুলকানি
আর জ্বালা-যন্ত্রনা
ভুলে যান!
নাইসিল
ব্যবহার করুন!
সবচেয়ে দ্রুত
আরামদায়ক ঘামাচি-
নাশক পাউডার
২ রকমের
প্যাকে পাওয়া
যায়—'ব্লু' আর
'স্যাণ্ডেল উড'।
নাইসিল আনুন
ঘামাচি ভুলুন
মাত্র টা.৬.৬৩প.*
* সর্বাধিক খুচরো দাম।
স্থানীয় কর আলাদা।
একমাত্র ঘামাচি মারার পাউডারই
চুলকানি আর জ্বালার অস্বস্তি
থেকে আপনাকে সবচেয়ে দ্রুত
আরাম দেয়।
বিশেষ ওষুধ মেশানো নাইসিল
ঘামাচি প্রতিরোধ করে
প্রতি ধাপে।
১. অতিরিক্ত ঘাম হওয়া
নিবারণ করে।
২. ঘাম শুষে নেয়।
৩. দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী জীবাণু
নষ্ট করে।
৪. ত্বকে স্নিগ্ধতা এনে দেয়।
nycil
Sista's-GN-79-364-Ben



চিপকে গাভাসকর ও বিশ্বনাথ

রায়ান অমলরাজ



বিশ্বনাথ

মাদ্রাজে চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনে আগের দিনের নট আউট গাভাসকর ও নৈশ প্রহরী ব্যাট করছে। গাভাসকর অর্ধশত রান পূর্ণ করার পর আমার পরের আসনের সবজান্তা দর্শকটি হঠাৎ বলে উঠলেন, একগাদা রেকর্ড আছে মশাই এই গাভাসকরের। নিশ্চয়ই সে আরও একটি রেকর্ড করবে। ভদ্রলোকের মুখের কথা শেষ হওয়ার মুহূর্ত মধ্যে গাভাসকর আউট। মাত্র ৩ রানের জন্য টেস্টে ৫ হাজার রান অপূর্ণ রইল।

ব্যাটের এই ক্ষুদে রাজপুত্র 'সানির' কাছে ৫০ রান করা কোন ঘটনা নয়। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি মাদ্রাজের পিচে এটিই তার সর্বোচ্চ রান। মাত্র কদিন আগে টেমস নদীতে দুশোর উপর রানের আগুন ছড়িয়ে দেওয়া ব্যাট থেকে বিরাট কিছু আশা করে দর্শকরা এসেছিলেন। সবাই বিমর্ষ হলেন। প্যাভিলিয়নে গাভাসকরও এখানে তার বারবার ব্যর্থতার কারণ খতিয়ে বের করতে মাথা ঘামাচ্ছিল। মনে মনে সানি নিশ্চয়ই তার মাদ্রাজ-ফ্যানদের নিরাশ করার জন্য দুঃখবোধ করছিল। ভেঙ্কট তাকে বললেন, 'গেভী', এটা হার্ট এ্যাটাক!

গাভাসকর পরে আমাকে বলল, কোন স্নায়ুর চাপে আমি ভুগছি না। আসলে বিশ্বনাথ যেমন কানপুরে সব সময় ভালো ব্যাট করে, তেমনি আমার কাছে পোর্ট অব স্পেন। তবু আমি এখানে কেন ব্যর্থ হলাম তার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

অবশ্য এই পিচে বিশ্বনাথ কিন্তু তার অর্ধাঙ্গিনীর দাদার থেকে ভালো ব্যাট করেছে।

চিপকে বিশ্বনাথ

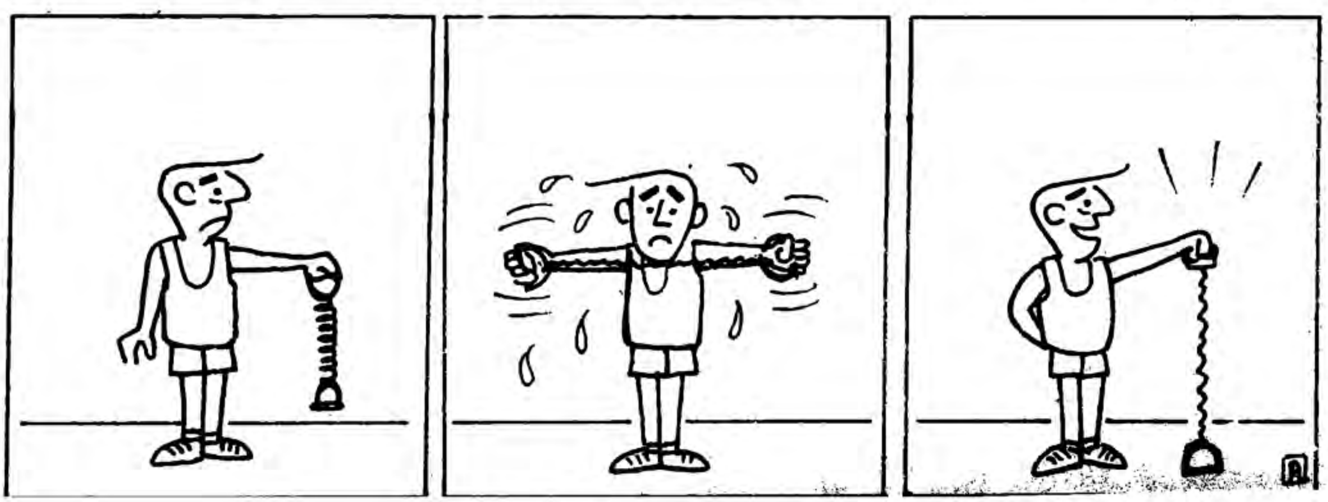
১৯৭২-৭৩	বনাম ইংল্যাণ্ড	৩৭ ও ০
৭৪-৭৫	বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৯৭ নঃ আঃ ও ৪৬
৭৬-৭৭	বনাম নিউজিল্যাণ্ড	৮৭ ও ১৭
৭৬-৭৭	বনাম ইংল্যাণ্ড	৯ ও ৬
৭৮-৭৯	বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১২৪ ও ৩১
১৯৭৯	বনাম অস্ট্রেলিয়া	১৭



গাভাসকর

চিপকে গাভাসকর

১৯৭২-৭৩	বনাম ইংল্যাণ্ড	২০ ও ·০ নঃ আঃ
৭৬-৭৭	বনাম নিউজিল্যাণ্ড	২ ও ৪৩
৭৬-৭৭	বনাম ইংল্যাণ্ড	৩৯ ও ২৪
৭৮-৭৯	বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৪ ও ১
১৯৭৯	বনাম অস্ট্রেলিয়া	৫০



ক্যারাটে ওলিম্পিকে ভারতের পাঁচজন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ জাপানের ক্যারাটের বিশ্ব সংস্থার অনুমোদিত একমাত্র ভারতীয় ক্যারাটিকা দাদি বালসারা ১৯ অক্টোবর টোকিও যাচ্ছেন পাঁচজনের একটি দল নিয়ে। টোকিওতে ১৮ থেকে ২৩ নভেম্বর দ্বিতীয় 'ক্যারাটে ওলিম্পিক' হচ্ছে চার বছর পরে। এই ওলিম্পিকে 'ফুল কনট্যাক্ট' নক আউট ক্যারাটে প্রতিযোগিতা হবে। অর্থাৎ প্রতি-পক্ষকে সম্পূর্ণ ঘায়েল না করে বিজয়ী পরের রাউণ্ডে লড়তে পারবেন না। নক আউট প্রতিযোগিতার জন্য কোন তালিকা তৈরি হয় না। বিচারকরা নম্বর ধরে যে কোন দু'জন প্রতিযোগীকে মঞ্চে নিয়ে আসেন এবং প্রায় মুহূর্তের মধ্যে জয় পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। বিজয়ীদের জন্য আলাদা তালিকা থেকে শেষ পর্যন্ত ফাইনালে দুই প্রতিযোগীকে লড়তে হয়।



ক্যারাটে ওলিম্পিকে ভারতীয় দল ঃ অমিতাভ দত্ত, নিজামুদ্দিন সাবির, অধিনায়ক দাদি বালসারা, শিবাজী গাঙ্গুলি ও প্রসেনজিৎ সাহা

দলনেতা দাদি বালসারা এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যারাটে ওলিম্পিকের সব তথ্য জানিয়ে বলেন, ভারতীয় ক্যারাটিকাদের বাছাই করা হয়েছে জাতীয় পর্যায়ে প্রথমে ও পরে আলাদা করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। দলের সদস্যদের সম্পর্কে বালসারা আস্থা প্রকাশ করে বলেন, ওরা প্রত্যেকেই কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

দ্বিতীয় ক্যারাটে ওলিম্পিকে ১৩৭টি দেশ থেকে প্রায় পাঁচশোর মত প্রতিযোগী যোগ দেবেন। ওলিম্পিকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত বিচারকদের মধ্যে থাকবেন এডওয়ার্ড কেনেডি, জর্ডানের রাজা হুসেন, স্পেনের ভূতপূর্ব রাজা কারলোস প্রমুখ।

জাপান সরকার প্রতিটি দলের সদস্যদের যাতায়াতের ভাড়া ছাড়া টোকিওতে সমস্ত ব্যয়-ভার গ্রহণ করে চার কোটি ডলারের এক বাজেট তৈরি করেছে।

ভারতীয় দলের সদস্যদের নাম ঃ দাদি বালসারা (অধিনায়ক), অমিতাভ দত্ত (জাতীয় চ্যাম্পিয়ন), শিবাজী গাঙ্গুলি (কলকাতা), প্রসেনজিৎ সাহা (কলকাতা) এবং নিজামুদ্দিন সাবির (বিহার)। মধ্যপ্রদেশের কিশোরী-লালকে রিজার্ভে রাখা হয়েছে।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে দাদি বালসারা আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তান স্পোর্টস কাউন্সিল মনোনীত দু'জন ক্যারাটিকা উপস্থিত ছিলেন। ●

বাংলার সাঁতার সংস্থায় আজব নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ প্রায় এক বছর পর রাজ্য সাঁতার সংস্থা নতুন সংবিধান পরিবর্তনের সুফল কিছুটা পেল। ২৮ আগস্ট রাজ্য সাঁতার সংস্থার বড় শরিক কলকাতা সাঁতার অঞ্চল তাদের সাধারণ সভায় মোট আটটি প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ নিতে গিয়ে রাজ্য সাঁতার সংস্থাকে বার হাজার ছ'শো টাকা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিল বাতিল রাজ্য সাঁতার সংস্থার নতুন নির্বাচনকে ঘিরে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিয়ে সাংবিধানিক অধিকারে নির্বাচিত হলেন কলকাতা অঞ্চল থেকে আটজন প্রতিনিধি।

এই প্রথম রাজ্য সাঁতার সংস্থার ভঁাড়ে ভবানী দশা কিছুটা ঘুচল। রাজ্য সাঁতার সংস্থা পরিবর্তিত সংবিধানের আওতায় সাঁতারের ক্লাবগুলির কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা পেল। কলকাতার সাঁতারের ক্লাবগুলি তাদের সদস্যদের কাছ থেকে মাথা পিছু এক টাকা আদায় করে রাজ্য সাঁতার সংস্থার তহবিলে জমা দিয়ে এই রাজ্যের সাঁতারে ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ নিল।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, মাস দুই আগে রাজ্য সাঁতার সংস্থায় চরম দলাদলির ফলে সভাপতির নির্দেশে পুরাতন কমিটি বাতিল গণ্য হয় এবং নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় সেপ্টেম্বর মাসের দু'তারিখে। সারা পশ্চিম বাংলার জেলা ভিত্তিক অঞ্চল নিয়ে (যার মধ্যে কলকাতাও একটি অঞ্চল হিসাবে গণ্য) নতুন নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে দিল এই রাজ্যের সাঁতারের কোন্দল কি পর্যায়ে এসে পড়েছে।

যাইহোক, কলকাতা অঞ্চলের সাধারণ সভার শুরুতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়ের আলোচনা আগে হওয়ার দাবী গৃহীত হয়। কারণ, প্রথম বিষয়টি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ওই দিনে উনিশটি ক্লাবের উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে আটজনের নির্বাচন ছিল সভার প্রধান কাজ। সুতরাং দ্বিতীয়, তৃতীয় বিষয়ে কোন রকম বাদানুবাদের সৃষ্টি না হয়ে পুরনো কর্মকর্তাদের নতুন করে আবার নির্বাচন করা চল বিনা বাধায়। যিনি নিজের ক্লাবের ওয়াটারপোলোর চল গত কয়েক বছর বন্ধ করে দিয়েছেন তাকেই ওয়াটারপোলো সিলেকশন কমিটির কনভেনার করা হল। কলকাতা অঞ্চলের ওয়াটারপোলো সিলেকশনকে ঘিরে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ চরমভাবে ফেটে পড়ে তাকেই করা হল ওই কমিটির সদস্য। এমন একজনকে ওই কমিটির চেয়ারম্যান বানানো হল যিনি ২৭ বছর আগে ওলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। যখনই অভিযোগ হল 'এতো নতুন বোতলে পুরাতন মদ' তখনই বলা হল ক্লাব হিসাবে নির্বাচন হয়নি—ব্যক্তি হিসাবে উপযুক্তদের নির্বাচন করা হয়েছে। অথচ পশ্চিমবাংলায় ১৯৭০-এর রৌপ্যপদক বিজয়ী ওয়াটারপোলো দলের অধিনায়ক পীযূষ মিত্রের নাম উত্থাপনই হলো না। ওই দলের আরও কয়েকজন প্রতিনিধি অশোক বিশ্বাস ও আবদুল মতলিবের নাম যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারল না।

প্রথম বিষয়টি নিয়ে আলোচনার শুরুতে দেখলাম জাতিভেদের দম্ভ। অর্থাৎ কলকাতার বড় ক্লাবগুলির মুখে বড় বড় আওয়াজ। বড় ক্লাবগুলি বেশী সদস্যদের জোরে রাজ্য সাঁতার সংস্থায় বেশী টাকা দেওয়ার দাবীতে তারাই কেবল প্রতিনিধিত্বের যোগ্য এই দাবী উত্থাপন করতে থাকে। ছোট ক্লাবগুলি অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়ে গণতন্ত্রের আওয়াজ আওড়াতে শুরু করল। অফিস ক্লাবগুলি আরও ছোট। সুতরাং তারা একেবারে চুপসে গেছে। আলোচনা চলতে চলতে নানা তর্ক বিতর্ক আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুলল। অফিস ক্লাবগুলির দাবীঃ বাংলার সাঁতারুকুলকে চাকরি দিয়ে তারা সহায়তা করে এসেছে। সুতবাং তাদের দাবী উপেক্ষিত হলে সাঁতারুদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাও ক্রমশ হ্রাস পাবে। স্টেট ব্যাংকের প্রতিনিধি সখেদে বললেন, টাকাটাই যদি নির্বাচনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আগে জানালে সমস্ত কর্মচারীর কাছ থেকে মাথা পিছু এক টাকা তুলে আমরা সবার চেয়ে বেশী টাকা দিতে পারতাম। কিন্তু এই সভা কি এই আশা দিতে পারে যে বেশী টাকা দেবে সেই নির্বাচিত হবে? সভায় হাসির রোল পড়ে গেল। বড় ক্লাবগুলি কেবলই জোরাল দাবী তুলে অবজ্ঞার সুরে বলতে লাগল—ছোট ক্লাবগুলির অভিজ্ঞতা নেই, সঙ্গতি নেই এবং সামর্থ্যও নেই, তাদের অনেকের বার্ষিক জলক্রীড়া করার ক্ষমতাও নেই, সুতরাং তাদের নির্বাচিত হওয়ার অধিকারও নেই। সভায় একজন প্রস্তাব রাখলেন—ক্লাবের কথা ছেড়ে দিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যোগ্য লোকদের বাছাই করে মনোনীত করা হোক। তাই যুক্তির প্রতিবাদে একজন সোচ্চার হয়ে বলে উঠলেন—গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগ্য অযোগ্য বিচারের কোন মাপকাঠি নেই। সুতরাং এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া হলে ব্যক্তিত্বের অবমাননা করা হবে। এই সভার কোন অধিকার নেই—আটজনকে মনোনীত করে বাকি সকলকে অযোগ্য বানানো। সকলের সমান অধিকার যেখানে স্বীকৃত সেখানে বড় ছোট, যোগ্য অযোগ্য এই তুলনামূলক সমালোচনা অশাস্ত্রীয়। শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক ভিত্তিতে কলকাতাকে উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য ও অফিস এই চার ভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত হল। এবং সভার আলোচনায় ঠিক হল প্রত্যেক ক্লাবের প্রতিনিধিই চক্রাকারে রাজ্য সাঁতার সংস্থায় যাওয়ার অধিকার পাবে এক বছর অন্তর। তবে রাজ্য সাঁতার সংস্থায় এদের মধ্যে যারা গদিতে বসার অধিকার পাবেন তারা ছাড়া (কারণ তাদের মেয়াদ চার বছর) বাকি সকলকেই ডেকে আনা হবে একবছর পর নতুনদের সুযোগ দেওয়ার জন্য। অভিনব চিন্তাধারা এতই অবাস্তব যে কোন সংবিধানে এর সমর্থন পাওয়া যায় না। সুতরাং এইভাবে উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার বড় বড় ক্লাবগুলি ছোটদের ধোঁকা দিয়ে বেশী টাকা দেওয়ার জোরে নির্বাচিত হয়ে গেল সর্বসম্মতি ক্রমে। কেবল তিনটি অফিস ক্লাবের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে স্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া কলকাতা পুলিশ ও পরিবহণ সংস্থাকে হারিয়ে বিজয়ী হল। সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক অঞ্চল থেকে দুটি করে ক্লাবকে নিয়ে এবং অফিস থেকে একজনকে নির্বাচন করে সংখ্যা দাঁড়াল সাত। বাকি একটি আসনের জন্য বাদ পড়া ক্লাবগুলির মধ্যে নির্বাচনে অংশ নিল উত্তর কলকাতা থেকে জগজ্জননী ক্লাব, মহিলা সমিতি ও মধ্য কলকাতা থেকে কলেজ স্কোয়ার ক্লাব। জগজ্জননী দশটি ভোট পেয়ে সকলকে হারিয়ে নির্বাচিত হল। কলেজ স্কোয়ার পেয়েছিল পাঁচটি ভোট ও মহিলা সমিতি এক ভোট।

প্রকৃতপক্ষে ভোটাভুটির মাধ্যমে সব ক'টি আসনের নির্বাচন পর্ব শেষ করা হলে হয়তো দেখা যেত বড় ক্লাবের গলাবাজী ধোপে টিকছে না। তখন হয়তো দেখা যেত পদ্মলোচনের দলই শোভা বর্ধণ করার সুযোগ পেয়েছে বেশী। কলকাতার সাঁতারের সমাজে বড়দের ভূমিকা সম্বন্ধে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছে হয় রাজ্য সাঁতারের সঙ্গে থাক আর নয়ত আরও বড় হওয়ার আদর্শে দলত্যাগী হও। দলের মধ্যে থেকে বিরোধিতা করে, গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বাংলার সাঁতারকে ভরাডুবির পথে ঠেলে দিয়ে বাংলার কয়েকটি বড় ক্লাব যে ভূমিকা নিয়েছে তারই প্রতিবাদে ছোটরা আনুগত্যের প্রশ্ন তুলে বড়দের সন্দেহের নজরে দেখছে। সুতরাং বড় ক্লাবের কয়কটি আদর্শের দিক থেকে কিছুটা অচ্ছুত হয়ে পড়েছে। কলকাতা অঞ্চলের সাধারণ সভায় সেই ইঙ্গিত পাওয়া গেল। এখন দেখা যাক রাজ্য-ভিত্তিক নির্বাচনে বড় ক্লাবের ভূমিকা কি মর্যাদা পায়।



থম দিন, কপিলের বলে ডার্লিং আউট। স্লিপে দুই ফিল্ডার গাভাসকর ও বিশ্বনাথ



কপিলদেবের সেই পরিচিত রূপ, মারমুখী ব্যাটিং

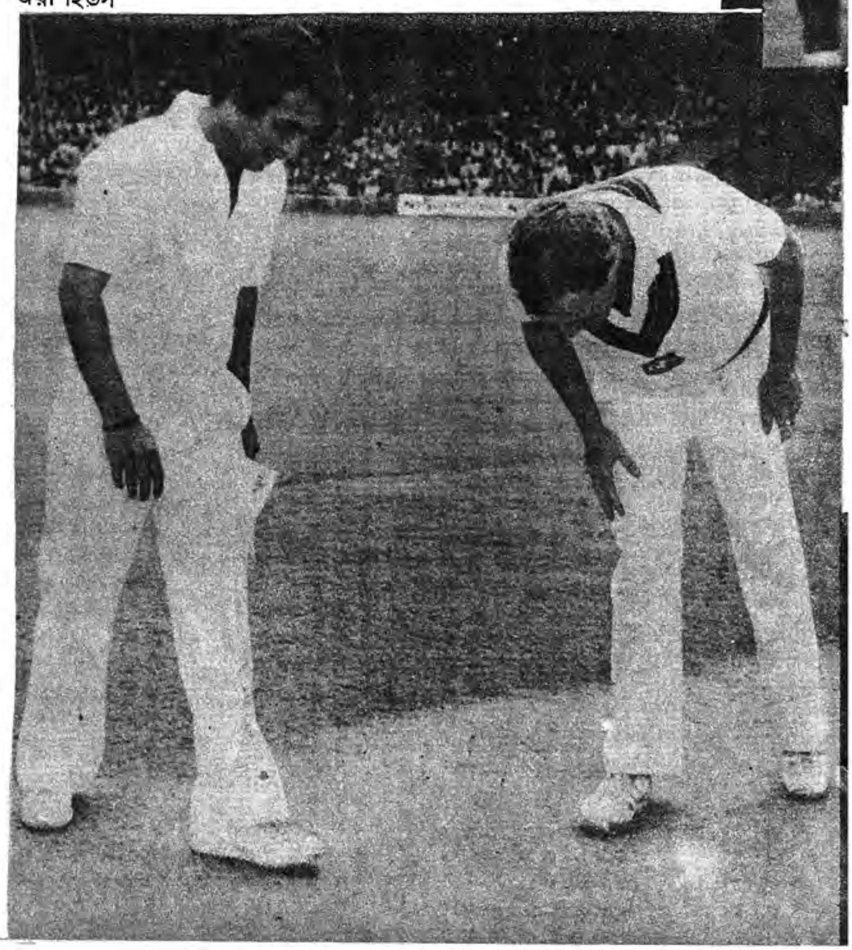


দোশির বল তুলেছেন বর্ডার, বল ভেসে গিয়ে যাদবের হাতে পড়ে, বর্ডার আউট। (প্রথম ইনিংস)



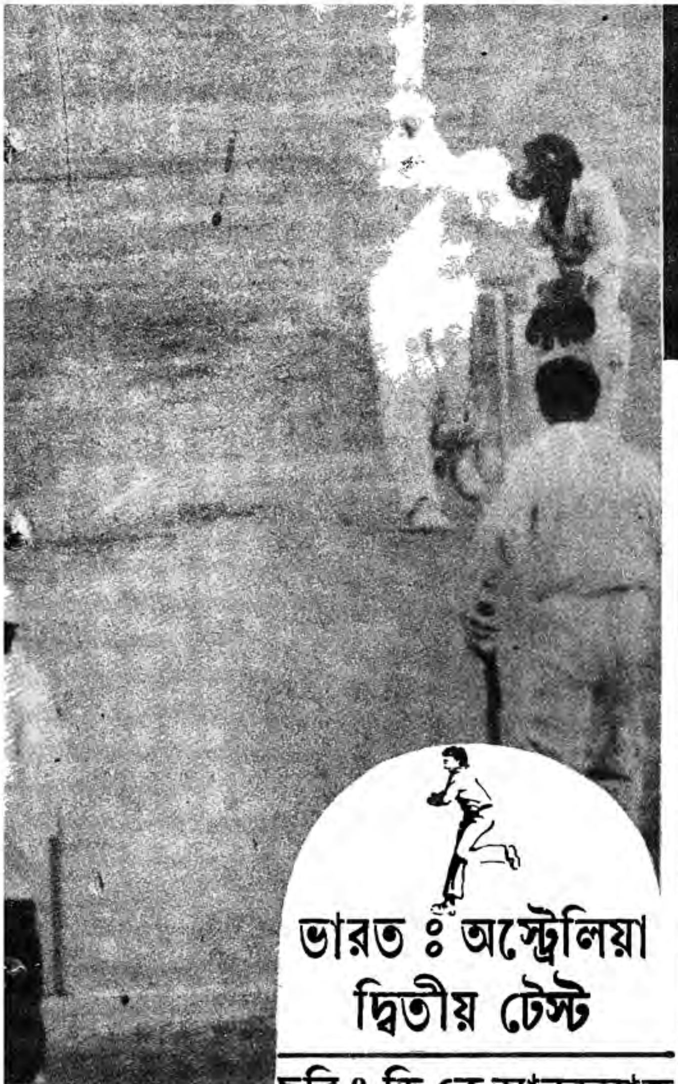
বাউণ্ডারি—হিউজ ৫২

টসের পরে দুই অধিনায়কের দৃষ্টি মুদ্রার দিকে। গাভাসকরের মুখে হাসি, জয়ী হিউস



ভারত ঃ অস্ট্রেলিয়া
দ্বিতীয় টেস্ট

ছবি ঃ ডি কে আনন্দরাজ





আউট—দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত ; ভেঙ্কটের বলে হিউস এল বি ডব্লিউ

দলনায়ক হিউসের মাথায় হাত — হিগসের (বাঁদিকে বল করছে) বার বার 'নো বল' ডাকায় বিরক্ত হিগস লাথি মেরে স্ট্যাম্প ফেলে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, আম্পায়ার ব্যাপারটি হিউসের দৃষ্টিতে আনেন



এখন কী করছেন

বিনু চ্যাটার্জি ঃ ছায়াছবির জগতে বব দাসকে অনেকে চিনলেও বক্সার ভবানী দাসকে কজনই বা এখন চিনতে পারবেন। ১৯৪৮ সালে লণ্ডন ওলিম্পিকে চান্স পেয়েও তার যাওয়া হয়নি। বক্সারদের দিতে হবে তিন হাজার টাকা, কিন্তু ভবানী দাস তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সেদিন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন কই ফুটবল, হকি খেলোয়াড়দের ওই টাকা দিতে হচ্ছে না। তবে বক্সারদের কেন যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও টাকা দিয়ে যেতে হবে। ফলে ভবানী দাস বাদ পড়লেন লণ্ডন ওলিম্পিক দল থেকে। আজ আর তার কোন আফসোস নেই যে কোন খেলোয়াড়কে আজ আর পয়সা দিয়ে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে বাইরে যেতে হয় না। এইটিই ওর আনন্দ। প্রতিবাদটা তাহলে কাজে লেগেছে।

১৯২২ সালের ১২ অক্টোবর ভবানী দাসের জন্ম। ছেলেবেলা থেকে খেলাধূলার দিকে ঝোঁক ছিল। মনোহরপুকুর রোডের একটি ক্লাবে তিনি জিমন্যাস্টিক্স শুরু করেন। ফুটবল খেলাও চলতে থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে। ১৯৩৯ সালে ইণ্টার স্কুল ফুটবল লিগ প্রতিযোগিতায় তিনি সাউথ সুবার্বান স্কুলের অধিনায়ক। ওই বছরই অল বেঙ্গল স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপে ভবানী দাস শ্রেষ্ঠ বক্সারের সম্মান পেলেন। মোট ৪০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন ওই লড়াইয়ে। তার বক্সিং-এর গুরু ছিলেন সন্তোষ কুমার দে ও পি এল রায়। তবে তিনি লক্ষ্য করতেন ঃ কিভাবে জগৎ শীল, কালু মিশ্র, বলাইদাস চ্যাটার্জি, রবীন সরকাররা লড়ছেন। তাদের লড়াই দেখে ভবানী দাস মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এদের মতই লড়তে হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তখন ঘোর ঘনঘটা। ১৯৪৩ সালের ২১ মে কলকাতায় গ্লোব থিয়েটারে একটি ইণ্টারন্যাশনাল লড়াইয়ের ব্যবস্থা হল। লড়াই হবে সিভিলিয়ানদের সঙ্গে রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভি, বার্মা নেভি, ইউ এস এয়ার ফোর্স, ইউ এস আর্মির সঙ্গে। ভবানী দাস সিভিলিয়ান দলে স্থান পেলেন। ওই লড়াই-এ সিভিলিয়ানরা জিতেছিলেন ৯-৪ লড়াইয়ে। ভবানী দাস পয়েণ্টে জয়ী হন। ১৯৪৪ সালের ১২ জানুয়ারি যশোরে হল বড় লড়াই। বাঙালী দলের সঙ্গে লড়বে রয়াল এয়ার ফোর্স। যারা জিতবে, তারাই পাবে উইং গেট কাপ। বাঙালী টিমে রইলেন, এস চ্যাটার্জি, বি ঘোষ, এফ সুর, পি বসু, বি চৌধুরী, এইচ পাল, এস বসু, ভবানী দাস ও একজন মাত্র অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কেনেল বাগ। শুরুতেই পরপর তিনটি লড়াইয়ে বাঙালীরা হেরে গেল। চতুর্থ লড়াইয়ে ভবানী দাস এগিয়ে এলেন। গ্যালারি থেকে এয়ার-ফোর্স দলের সমর্থকরা খুব চিৎকার করছেন, 'কিল দ্য নিগার', 'ফিনিস হিম', 'নক হিম আউট' ইত্যাদি। সেই অবস্থায় পরপর তিনজনের পরাজয়ের পর সোজা হয়ে রিঙের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন ভবানী দাস। এয়ার ফোর্সের হাডসন প্রতিপক্ষ। শুরু হল সেই ঐতিহাসিক লড়াই। হাডসনের লড়াইয়ের ভঙ্গী ছিল ভবানী দাসকে একেবারে নক আউট করে দেওয়া। কিন্তু ভবানী দাস সেই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে বুদ্ধির জোরে হাডসনের মারগুলো এড়িয়ে আস্তে আস্তে হিট করে লড়াইয়ে পয়েণ্টে জয়ী হলেন। চাকা ঘুরে গেল। একটানা পাঁচটি লড়াইয়ে বাঙালীরা জয়ী হলেন। ফল ৬-৩।



ভবানী দাস (বব) ও উত্তমকুমার

১৯৪৪ সালে ২৬ জানুয়ারি অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ হল লাহোরে। যোগ দিল সিভিলিয়ান, ইউ এস আর্মি, ইউ এস নেভি, ইউ এস এয়ারফোর্স, রয়াল এয়ারফোর্স, রয়াল নেভি, ইণ্ডিয়ান নেভি, ব্রিটিশ আর্মি। মোট ৩৮০ জন বক্সার। সেই লড়াইয়েও ভবানী দাস ফ্লাইওয়েটে অভাবনীয় সাফল্য পেলেন। একটার পর একটা জিতে তিনি ফাইনালে উঠলেন। কিন্তু ফাইনালে পরাজিত হলেন ইণ্ডিয়ান আর্মির লালবাহাদুর থাপার কাছে। রানার্স ট্রফিটি পেয়ে বাঙালীর সম্মান বহন করে আনলেন ভবানী দাস। ১৯৪৫ সালে ১৭ এপ্রিল কলকাতায় ভারত, বার্মা, চীন, আমেরিকা, ব্রিটিশ ও ইণ্ডিয়ান আর্মির মধ্যে যে লড়াই হল, তাতে যোগ দিয়েছিল মোট ২৪৭ জন বক্সার। এই প্রতিযোগিতায় রয়াল এয়ার ফোর্সের জনি কেন সেমিফাইনালে ভবানী দাসকে হারিয়ে দেন। ওই প্রতিযোগিতায় কেনই চ্যাম্পিয়ন হন।

ভবানী দাস মনে করলেন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনের ও শরীরের জোর কমে আসবে। লড়াইয়ে তাকে একদিন ধরাশায়ী হতে হবে। তাই তিনি অন্য কিছু শেখবার দিকে নজর দিলেন। পরিচিত হলেন ডাঃ ডোনাল্ড জোসেফ ডায়াসের সঙ্গে। তিনিই স্কুল অফ মিউজিকে তাকে নিয়ে গেলেন। ভবানী দাস পাশ্চাত্য নৃত্য শিখলেন। পিয়ানো শিখলেন প্রফেসর কাসানোভার কাছে। ভায়োলিন শিখলেন স্ট্যানলি গোমসের কাছে। আর ব্যালে নাচ শিখলেন ভ্যালেনটিনা ভ্লাভিরো-ভার কাছে। পাশ্চাত্য নৃত্য তার সম্পূর্ণ দখলে এল। তখন থেকেই তার নাম ভবানী দাস থেকে রূপান্তরিত হলো বব দাসে। বহু ছায়াছবিতে তাকে দেখা গেছে নৃত্য পরিচালক হিসাবে। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণ কুমার, দিলীপ রায়, দেবরাজ, সুপ্রিয়া চৌধুরী, ললিতা চ্যাটার্জি, সুমিত্রা সান্যাল, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, সন্ধ্যা রায়, জ্যোৎস্না রায়, শ্রাবণী বসু, মঞ্জু চক্রবর্তী, রত্না ঘোষাল, মহুয়া রায়চৌধুরী, অপর্ণা সেন এবং উত্তমকুমারও তার কাছে নাচ শিখেছেন। এরমধ্যে উত্তমকুমার শিখেছেন একটানা পাঁচ বছর। বব দাস বললেন, অতীতের খেলোয়াড়দের বর্তমানে দুঃখ কষ্টের কথা কিছু পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি, তা আমাকে খুব ব্যথিত করে। তাই খেলায় থাকতে থাকতে ভবিষ্যতের জন্য তাদের কিছু একটা ব্যবস্থা করে নেওয়া উচিত। মনোহরপুকুর রোডের বাড়িতে ভবানী দাস এখন স্ত্রী ও দুই ছেলে প্রণব ও প্রবীর দাস ও আর এক পালিত পুত্র বাপিকে নিয়ে সুখে সচ্ছন্দে বাস করছেন। ●

মুর্শিদাবাদে দূরপাল্লার সাঁতার ঃ এবারও খগেন প্রথম

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ৭৪.৪৮ কিলোমিটার সাঁতারে প্রথম হয়েছে পশ্চিমবাংলা পুলিশের শক্ত সমর্থ শ্যামলা চেহারার খগেন্দ্রনাথ দত্ত। এশিয়ার দীর্ঘতম এই দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা এবার ৩৬ বছরে পা দিল। জঙ্গীপুরের রঘুনাথগঞ্জ ঘাট থেকে বহরমপুর সদর ঘাট পর্যন্ত সাঁতারে খগেনের সময় লেগেছে ১১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট। এর আগে '৭৬ সালেও খগেন এতে প্রথম হয়েছিল।

এবছর মোট ১৪ জন প্রতিযোগী ছিল। ভোর ৫-৩৩ মিনিটে সাঁতার শুরু হয়। এরমধ্যে ভিনরাজ্য থেকে এসেছিল একজন। অবশ্য গুজরাট থেকে আসা প্রকাশচন্দ্র গাঙ্গেশওয়ালা শেষ পর্যন্ত জল থেকে উঠে পড়ে অসুস্থতার জন্য। প্রত্যেক প্রতিযোগী পিছু একটি করে নৌকার ব্যবস্থা করেছিলেন উদ্যোক্তারা। এছাড়াও ছিল তিনটি লঞ্চ। গোড়া থেকেই খগেন সকলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের অভিনন্দন ও হাততালি কুড়িয়ে।

খগেন ৺সুধাংশু শেখর বাগচী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শিল্ড পায়। চুঁচুড়া সুইমিং ক্লাবের স্বপন রায় দ্বিতীয় স্থানটি দখল করে। তারও বেশ কিছুক্ষণ পরে মুর্শিদাবাদের শিবলাল সাহা সমাপ্তি রেখায় পৌঁছে তৃতীয় হয়।

একই দিনে ছেলে এবং মেয়েদের জিয়াগঞ্জ থেকে বহরমপুর সদরঘাট পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯ কিলোমিটার সাঁতারে মেয়েদের বিভাগে ৫ জনের মধ্যে প্রথম হয়েছে কলকাতার বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির রীণা ব্যানার্জি (২ ঘণ্টা ৩৪.৩০ সেকেণ্ড)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার দুই প্রতিযোগিনী অর্চনা রায় (এম এস ইউ) এবং নমিতা সাহা (সেবা মিলনী)। গুজরাটের সুরাট সুইমিং অ্যাণ্ড বোটিং অ্যাসোসিয়েশনের বিরোজ নাদিরশাদারওয়ালা নাম পাঠিয়েও এই বিভাগে অংশ নিতে পারেনি শেষ মুহূর্তে অসুস্থ হয়ে পড়ায়। ছেলেদের বিভাগে শ্যামনগর সুইমিং ক্লাবের মহসীন মণ্ডল প্রথম দিকে সবার আগে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তৃতীয় হয়। কাশিমবাজারের ছেলে নিরঞ্জন দেবনাথ (১ ঘণ্টা ১৭ মিনিট) ও কলকাতার অরুণ চক্রবর্তী যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় হয়েছে। উল্লেখ্য সি এস টি এ সি-র সভ্য অরুণ প্রথমে ৭৪ কিলোমিটারে নাম দিয়ে নাম প্রত্যাহার করে ১৯ কিলোমিটারে নেমেছিল। এই



বাঁদিক থেকে খগেন্দ্রনাথ দত্ত, রীণা ব্যানার্জি, নিরঞ্জন দেবনাথ

বিভাগের ৩১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে বহরমপুরের ১৬ বছর বয়সী কৌশিক সাহা রায় নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে সকলের প্রশংসা পায়।

সবদিক মিলিয়ে এবারের প্রতিযোগিতা পুরোপুরি সাফল্য না পেলেও খুব একটা খারাপও হয়নি। বহরমপুর প্রতিযোগীদের থাকা ও খাওয়ার যে ব্যবস্থা উদ্যোক্তারা করেছিলেন তাতে সকলেই মোটামুটি খুশী। তবে লোডশেডিংয়ের জন্য গরমে প্রতিযোগীরা রাত্রে ভাল ঘুমোতে পারেনি। কলকাতা থেকে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ স্পোর্টস মেডিসিনের ডাক্তার পি কে দেবনাথের নেতৃত্বে ছ'জনের একটি বিশেষজ্ঞ দল হাজির ছিলেন, এবং প্রতিযোগিতার আগে ও পরে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ভালভাবে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। এছাড়া অন্যান্য ব্যবস্থাও ভালই ছিল। এবছর এই প্রতিযোগিতার বাজেট ছিল ৪৩ হাজার টাকা। যার মধ্যে রাজ্য সরকারের অনুদান পাওয়া গেছে যথাক্রমে ৫ হাজার ও ৭ হাজার টাকা। বাকি টাকা তোলা হবে সুভেনিয়র ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। এছাড়া রয়েছে প্রত্যেক প্রতিযোগীর কাছ থেকে নেওয়া প্রবেশ মূল্য।

উৎসবের আনন্দে
সুর যোগাবে এইচ-এম-ভি

① ক্যালিপ্‌সো পপুলার ঃ এ. সি. অথবা ব্যাটারী মডেলের হাফফিক্স রেকর্ড প্লেয়ার অ্যাটাচমেণ্ট যাতে রেডিও বা অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে আপনার পছন্দের রেকর্ড বাজাতে পারবেন। **৩৩৫ টাকা***

② ফিয়েস্টা পপুলার ঃ ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় রেকর্ড প্লেয়ার। পোর্টেব্‌ল্‌। তিনটি স্পীড। ঢাকনায় লাগানো স্পীকার। এ. সি. অথবা ব্যাটারী মডেলে পাবেন। এক কথায় 'অদ্বিতীয়'। **৪৯৯ টাকা***

③ পপ্‌স্টার ঃ অভিনব গঠনের সুদৃশ্য ট্রান্সমেইন্স পোর্টেব্‌ল্‌ রেকর্ড প্লেয়ার। আকর্ষণীয় রং। অপূর্ব আওয়াজ। **৫০৮ টাকা***

④ সুইঙ্গার ঃ বিস্ময়কর পোর্টেব্‌ল্‌ রেডিওগ্রাম। এতে আছে ২ স্পীডের রেকর্ড প্লেয়ার ও মিডিয়াম, ২৫ মিটার ও ৩১ মিটার ব্যাণ্ডের শক্তিশালী রেডিও। **৫৯৭ টাকা***

⑤ স্যাফারী ডিলাক্স ঃ ৪ ব্যাণ্ড ও ৩ স্পীডের ট্রান্সমেইন্স পোর্টেব্‌ল্‌ রেডিওগ্রাম। দেখতে সুদৃশ্য, আওয়াজ অপূর্ব। **১০৩২ টাকা***

⑥ টেনর ঃ আধুনিক ক্যাসেট টেপ রেকর্ডার। এসি/ব্যাটারী চালিত। এল.ই.ডি. রেকর্ডিং লেভেল ইণ্ডিকেটর, কণ্ডেন্সর মাইক, অটো-স্টপ পিয়ানো কী ও অন্যান্য সুবিধা সম্বলিত। **৭৭০ টাকা***

⑦ কনসর্ট-২ ঃ আধুনিকতম ৩-ব্যাণ্ডের রেডিও ক্যাসেট রেকর্ডার। এ. সি./ব্যাটারী চালিত। শক্তিশালী কণ্ডেন্সর মাইক, 'স্লীপ' সুইচ, ব্যাটারী/রেকর্ডিং মিটার, অটো-স্টপ ও অন্যান্য বহু বৈশিষ্ট্য সম্বলিত। **১৪৭৭ টাকা***

ব্যবহারে অনবদ্য, উপহারে অনুপম
এইচ এম ভি'র যে কোনো সেট।

HMV
হিজ মাস্টার্স ভয়েস

*সর্বোচ্চ অনুমোদিত বিক্রয় মূল্য
উৎপাদন শুল্কসহ॥
কর অতিরিক্ত।



জাতীয় নৌ-বাইচে তামিলনাড়ুর আধিপত্য

মাদ্রাজ : সম্প্রতি এখানে আদিয়ার নদীতে তৃতীয় জাতীয় নৌ-বাইচ চ্যাম্পিয়নশিপে তামিলনাড়ু বাজীমাৎ করেছে ছটির মধ্যে তিনটি সোনা জিতে। পশ্চিমবাংলা পায় দুটি। শেষটি যায় কোর অব এঞ্জিনিয়ার্স দলের দখলে।

১২০ বছর আগে এদেশে ইংরেজরা খেলাধুলোর একটি অঙ্গ হিসেবে নৌ-বাইচ প্রবর্তন করে। প্রতিযোগিতা এদিক-ওদিক কিছু হতো। কিন্তু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের বয়স মাত্র তিনে পড়লো।

এর প্রথম আসর বসে ১৯৭৭-এ কলকাতায়। তখন কিন্তু পশ্চিমবাংলা পাঁচটি সোনা-ই জিতে নেয়। তামিলনাড়ু একটি। ১৯৭৮-এ পুনেতে দ্বিতীয় জাতীয় আসরে পশ্চিমবাংলা ও মহারাষ্ট্রর সঙ্গে তামিলনাড়ুও ছ'টি সোনা সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। এবারে ফলের ধারা প্রমাণ করছে তামিলনাড়ু বিষয়টিতেআধিপত্য করে ফেলেছে এবং এগিয়ে চলেছে।



ওপেন স্কালসে বিজয়ী তামিলনাড়ুর আর চন্দ্রমৌলি

জুনিয়র পেয়ার্সে বিজয়ী পশ্চিমবঙ্গের কে কে পারেখ ও এস গুপ্ত



'ওপেন স্কাল' বিষয়ে তামিলনাড়ুর আর চন্দ্রমৌলি পশ্চিমবাংলার এস আর কালিদাসকে হারিয়ে সোনা এবং জেরোলাক ট্রফি জেতে (৩ মি ৩৭ সে)। 'জুনিয়র ফোর্স' বিষয়ে এন খলিলি, অর্জুন শ্রীনিবাসন, এস জে রাজীব, প্রকাশ মাধবন ও সঞ্জয় মাধবন (তামিলনাড়ু) সোনা জিতে নেয় (৩ মি ২৮.৫ সে)। এখানেও দ্বিতীয় পশ্চিমবাংলা। পশ্চিমবাংলার প্রতিযোগীরা হল : ডি বিশ্বাস, এস কাপুর, এ ভাদুড়ী, এস আর উদয়শংকর ও এস ঘোষ। তামিলনাড়ুর তৃতীয় সোনা আনে প্রকাশ মাধবন 'জুনিয়র স্কাল' বিষয়ে পশ্চিমবাংলার এস আর উদয়শংকরকে হারিয়ে (৩ মি ৩৯ সে)। তিনটি বিষয়েই ব্যবধান ছিল আড়াই 'লেংথ'।

'পেয়ার্স' বিষয়ে দুটিই ওপেন এবং জুনিয়র পশ্চিমবাংলা দখল করে। ওপেন পেয়ার্স-এ এ সরকার ও এস মুখার্জি হারায় কোর অব এঞ্জিনিয়ার্স-এর ক্যাপ্টেন এন এস গ্রেওয়াল ও ডি এস গ্রেওয়ালকে (৩ মি ৩১ সে)। জুনিয়র পেয়ার্স-এ কে কে পারেখ ও এস গুপ্ত তামিলনাড়ুর এম এস অশ্বিন ও এন পৃথ্বীকে হারায় (৩ মি ৩৯ সে)।

শেষ সোনাটি ওপেন ফোর্স জিতেছে কোর অব এঞ্জিনিয়ার্স, সেই পশ্চিমবাংলা দলকে পরাজিত করে। বিজয়ী- ক্যাপ্টেন এন এস গ্রেওয়াল, ক্যাপ্টেন ভি জর্জ, ক্যাপ্টেন পি কে উবেরয়, ক্যাপ্টেন ডি এস গ্রেওয়াল ও ক্যাপ্টেন ডি কে ভাট গতবছর মহারাষ্ট্র দলের হয়ে এই বিষয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবারের বাংলা দলে, ছিল, টি চালক, জি এস মজুমদার, আর মুখার্জি, আর ব্যানার্জি ও এ কানুনগো। মাত্র এক লেংথে এরা হার স্বীকার করে।

গতবারের ২টি সোনা জয়ী মহারাষ্ট্রকে এবার চারটি ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

জিমন্যাস্টিক্স-এর তিন কৃতী

অতীন সরকার : বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে নিজে-দের দক্ষতা তুলে ধরতে সোভিয়েত জিমন্যাস্ট-দের তুলনা নেই। তা না হলে ১৯৫২ সালে ওলিম্পিকে অংশগ্রহণের প্রথম থেকে জিমন্যাস্টিক্স-এর স্বর্ণপদকের সিংহ ভাগ কেমন করে সোভিয়েতের পাশে যোগ হয়েছে। এ পর্যন্ত সেভিয়েত ইউনিয়ন যে সাতটি ওলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছে তার সব ক'টিতে সোভিয়েত মহিলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং ৬টিতে পুরুষ দল চ্যাম্পিয়ন। মণ্ট্রিয়ল (১৯৭৬) ওলিম্পিকে ব্যক্তিগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেভিয়েত ইউনিয়নের নিকোলাই আন্দ্রিয়ানভ এবং রুমানিয়ার নাদিয়া কোমানেচি।

এখানে বিশ্ববিখ্যাত তিনজন সোভিয়েত জিমন্যাস্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এরা তিনজনই ২২তম মস্কো ওলিম্পিকে অংশগ্রহণ করবেন।

আর্মি ক্লাবের জিমন্যাস্ট ভালদিমীর মার্কেলভ (২২) মস্কো ইনস্টিটুট অব ফিজিক্যাল কালচার এণ্ড স্পোর্টস-এর ছাত্র। ১৯৭৬ সালে মণ্ট্রিয়ল ওলিম্পিকে প্রথমদিকে তার সাফল্য ছিল বেশ ভালই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত [illegible] একটি [illegible] জন্য আর শেষ রক্ষা হল না। ভালদিমিরকে স্বর্ণপদকের আশা ছেড়ে রৌপ্যপদক নিয়েই দেশে ফিরতে হল ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সব কয়টি বিভাগেই সে সাফল্য দেখায় এবং ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন হয়। বিশ্বকাপ (১৯৭৮) প্রতিযোগিতায় সে ছিল নিকোলাই আন্দ্রিয়ান ভে-এর দলভুক্ত।



ভালদিমির মার্কেলভ



ইরিনা ডারিগিনা



লেনা ডাভিডোভা

১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে বিশ্ব জিম-ন্যাস্টিক্স আসর বসেছিল জাপানের টোকিও-তে। বিশেষজ্ঞরা তরুণী জেনা ডাভিডোভার এক্সারসাইজ দেখে এই মন্তব্যই করেছিলেন, তার প্রতিভা ও দক্ষতা টুরিশেভা ও ফিলাতোভা থেকে কম নয়। এই বছরই

সে সোভিয়েত জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরের বছর গুরুতর আঘাতের জন্য জাতীয় দল থেকে তার নাম বাদ যায়। ১৯৭৮ সালে সে 'বার'এ সোভিয়েত খেতাব অর্জন করে এবং আবার জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮ বছর বয়সের এই তরুণী এখন লেনিনগ্রাড ইনস্টিটুট অব ফিজিক্যাল কালচার এণ্ড স্পোর্টস-এর শিক্ষার্থী। ৯ বছর বয়স্কা লেনার মধ্যে প্রশিক্ষক গেন্নাদি করশুনভ যে প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন আজ তা প্রস্ফুটিত হয়েছে। আগামী ওলিম্পিকের জন্য লেনা তৈরি হচ্ছে তো বটেই। ১৯৭৮ সালে জাপানে সে তার প্রতিভার যোগ্য মর্যাদাও লাভ করেছে বিজয়ী হয়ে।

আর এক কৃতী জিমন্যাস্ট ইরিনা ডারিগিনা মণ্ট্রিয়ল ওলিম্পিকে প্রদর্শনী জিমন্যাস্টিক্স-এর আসরে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। আই ও সি কর্তারাও অপলক চোখে ইরিনার মডার্ন জিমন্যাস্টিক্স লক্ষ্য করেছেন।

১৯ বছর বয়স্কা ইরিনা ১৯৭৭ সালে ব্যাসেল-এ অনুষ্ঠিত মডার্ন জিমন্যাস্টিক্স বিশ্বচ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করে। লোকে যাকে বলে 'রূপার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম'। ইরিনা ঠিক তাই। বাবা ইফান দেরুগিন ১৯৫৬ মেলবোর্ন ওলিম্পিকে পেন্টাথলন চ্যাম্পিয়ন। মা আলবিনাও একজন দক্ষ অ্যাথলিট ছিলেন।

মা-বাবার ইচ্ছে সত্ত্বেও ইরিনা ক্রীড়া জগত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। প্রথমে সে কোরিওগ্রাফিক ও পরে ব্যালে শিখবার জন্য ভর্তি হয় কিয়েভ প্রফেশন্যাল ব্যালে স্কুলে। সেখানকার অপেরাও ব্যালে দলের সদস্যা হিসাবে মস্কোর ক্রেমলিন প্যালেস অব কংগ্রেসে 'সোভিয়েত সিন নামবার ওয়ান' এ অংশগ্রহণ করে ১৩ বছর বয়সে নিজেই আগের মত বদল করে স্পোর্টস জিমন্যাসিয়ামকে নিজের ভবিষ্যত বলে গ্রহণ করে। এখন সে ওলগা প্রখোভা ও ওলগা স্কায়েভ গোলেভার সঙ্গে জাতীয় সোভিয়েত মডার্ন জিমন্যাস্টিক্স দলের সদস্যা। প্রশিক্ষক স্বয়ং তার মা—আলবিনা দেরুগিনা, অনার্ড ট্রেনার অব দি ইউ এস এস আর। ●

হ্যানোভারে প্রবীণদের বিশ্বক্রীড়া

ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির হ্যানোভারে সম্প্রতি প্রবীণদের তৃতীয় বিশ্ব ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। ৪২টি দেশের ৩২০০ পুরুষ ও মহিলা প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ এতে যোগ দেন। ওলিম্পিকের আসরেই এধরনের বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগী আগে দেখা যেত।

সমস্ত আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপের মত এখানেও সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল। প্রাথমিক হিট, ইণ্টারমিডিয়েট হিট, মেজারিং টেপ, স্টপ ওয়াচ সব কিছু।

এই বিশ্বক্রীড়ার আসরে চল্লিশোর্ধ পুরুষ এবং পঁয়ত্রিশোর্ধ মহিলারাই যোগ দিতে পারেন। সব থেকে বয়সে বড় দুই প্রতিযোগী এসেছিলেন সুইডেন ও যুগোশ্লাভিয়া থেকে—এদের বয়স ৮৩।

অন্যান্য প্রতিযোগিতা থেকে এখানে একটি বড় পার্থক্য রয়ে গেছে। এখানকার প্রতিযোগীদের হ্যানোভারে আসা এবং সেখানে থাকার ব্যয়ভার নিজেদের বহন করতে হয়েছে ফলে যেসব প্রতিযোগী অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছেন তাদের ব্যয় হয়েছে ৬ হাজার জার্মান মার্ক।

সব থেকে আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা হয়েছে ম্যারাথন। এতে ৭৩১ জন প্রতিযোগী ছিল।

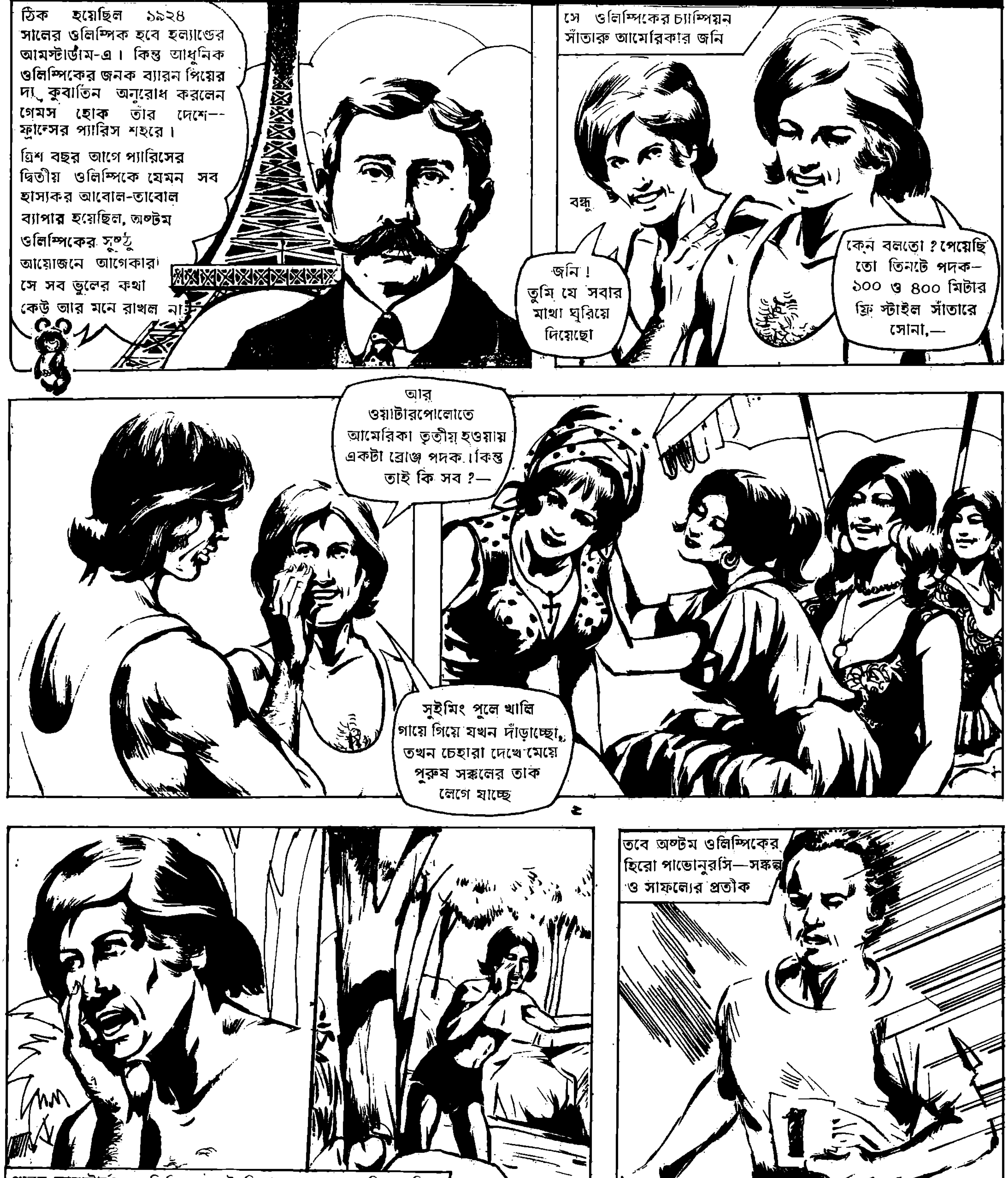
৬৪ বছরের দৃষ্টিহীন জার্মান প্রতিযোগী ফ্রিৎস এসমী ১০০ মিটার ১২·৭৪ সেকেণ্ডে দৌড়ে সাড়া জাগান।

এফ আর জি ২০টি প্রথম স্থান অধিকার করে শীর্ষস্থান পায়। তারপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—১০টি।



ওলিম্পিকের গপ্পো

লেখা : অশোক চট্টোপাধ্যায় রেখা : জি. সান্তা



সাবাশ গৌতম সরকার

আমি একজন ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক, কিন্তু আবার অভিনন্দন জানাই মোহনবাগান ক্লাবকে ও সেই সঙ্গে গৌতম সরকারকে ১৯৭৯ সালের আই এফ এ শিল্ড বিজয়ের জন্য। গৌতম সরকার যে এখনো বাংলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ হাফ ব্যাক, এই ফাইনালের দিনও তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন। এই দিনের খেলার ধারা-বিবরণী শুনে যতটুকু মনে হয়েছে ইস্টবেঙ্গল পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পায়নি। প্রথমার্ধে দুই একবার ও অন্তিম লগ্নে দুই একবার ছাড়া ইস্টবেঙ্গল সেরকম কোন আক্রমণই করতে


গৌতম সরকার

পারেনি। অথচ এবারে ইস্টবেঙ্গলে সর্বভারতীয় খেলোয়াড়রা রয়েছেন যাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না (?)। সাতজন বিভিন্ন রাজ্যের নামী দামী খেলোয়াড় এবার ইস্ট-বেঙ্গলে সেই সঙ্গে স্থানীয় তারকরা তো আছেনই। অপরদিকে মোহনবাগান মাত্র একজন ভিন্ রাজ্যের খেলোয়াড় ও বাকী বাংলার ছেলেদের নিয়ে গড়া দল নিয়ে সর্বভারতীয় দলকে একেবারে কোণঠাসা করে নিজেদের তথা বাংলার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখল।

শ্যামল কুমার চন্দ, ধানবাদ।

ফাইনালেও দিলীপ অসুস্থ ছিল ?

১৬ সেপ্টেম্বর সমস্ত বিতর্ক, উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে মোহনবাগান আই এফ শিল্ড লাভ করলো ইস্টবেঙ্গলকে ১—০ গোলে হারিয়ে। খেলার সামগ্রিক বিচারে সুসংহত দল ইস্টবেঙ্গল-এর সংহতি চূর্ণ করে নজর কেড়েছে মোহনবাগান। খেলার সময় মনে হয়েছে সারা মাঠ জুড়ে কেবলই মোহনবাগানের একাদশ মহারথীরই অবাধ বিচরণ। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যকর বিষয় হল গত দিনগুলির মত এদিনও মোহনবাগান দলনায়ক দিলীপ পালিতকে মাঠে দেখা গেল না। কিন্তু কেন ? সত্যি কি তিনি এদিনও অসুস্থ বা আনফিট, প্রশিক্ষক পি কে-এর বক্তব্য তাই। অন্তত পক্ষে দিলীপের খেলোয়াড় জীবন শেষ করতে তাকে বোধহয় এই কূট কৌশলের বশবর্তী হতে হয়েছিল। কিন্তু দোষটাই বা কি ? অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যদি অপরাধ হয়। নিজের দলের স্বার্থ নিয়ে কিছু করা যদি অপরাধ হয় তবেই বোধহয় তা সম্ভব হয়। এই অন্যায় দিলীপ-এর প্রতি করা সত্ত্বেও তার নির্বাক ভাবভঙ্গি এবং মাথা পেতে এই অন্যায়কে মেনে নেওয়া,সত্যি মনোমুগ্ধকর, তাই সবশেষে ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন এই যে অন্যায়ের যোগ্য প্রতিবিধান করাই এখন আমাদের কাম্য।

অশোক মজুমদার
১০/এ দেশবন্ধু রোড, কলকাতা-৩৫

আমাদের সহ্য করতেই হবে

দিলীপদার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটছে বা ঘটে গিয়েছে, সেজন্য খুবই দুঃখ পেলাম। তবে অবাক হইনি, কারণ এরকম ঘটনা আমাদের কাছে নতুন না। ফুটবলের 'মক্কা' বাংলার মাটিতে এরকম ঘটনা প্রতি বছরই ঘটে থাকে। কিছু নিরীহ, স্বার্থহীন, আত্মসম্মান-জ্ঞান সম্পন্ন ও উচিত বক্তা খেলোয়াড়দের এরকম পুরস্কার উপহার দিয়ে 'ফেয়ার ওয়েল' জানান হয়ে থাকে। কোন বার ক্লাব কর্তৃপক্ষ আর কোনবার কোচ দ্বারা এই সম্মান বিতরণ করা হয়।

এবার প্রদীপদার দ্বারা এই সম্মান লাভ করলেন দিলীপদা (সুধীরদাও)। প্রদীপদার মত সফল কোচ (যদিও ডুরাণ্ড ও রোভার্সের লজ্জাজনক হার) যদি একটা দুটো খেলোয়াড়ের ফুটবল জীবন নষ্ট করেন, তাতে ক্ষতি কি আছে ? এতে প্রদীপদার কি দোষ ? দোষ আমাদের মত অন্ধ সমর্থকদেরই ? আমরা ট্রফি পেলেই খুশী ? বড় বড় ক্লাবের পতাকা উড়িয়ে, মাইক বাজিয়ে, পটকা ফাটিয়ে, নিজেদের ক্লাব উক্তির পরিচয় দিয়েই সব শেষ। আর আমরা যে খেলোয়াড়কে পছন্দ করি না, তাকে গালিগালাজ করে খেলতে দিই না। (যেমন তপন দাস)। কিন্তু যখন কোন ভাল খেলোয়াড়কে খেলানো হয় না (দিলীপদা ও সুধীরদার মত) তারজন্য আমরা আজ পর্যন্ত প্রতিবাদ করিনি ? কারণ আমরা ব্যবসায়ী-দের মত লাভ চাই, লোকসান না। তাই প্রদীপদার মত কোচ যদি নিজের খেয়াল খুশী মত কাজ করেন, তা আমাদের সহ্য করতেই হবে। সহ্য করতে হবে নিরীহ ও ভাল খেলোয়াড়দের উপর অত্যাচার ও তাদের বলিদান।

গুরুদাস মুখার্জি ও গোরা ঘোষ,
রে সিনেমা রোড, ধানবাদ।

এমন নোটিশ কেন ?

৯-৯-৭৯ তারিখে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নোটিশ দেখে মর্মাহত হলাম। উক্ত ক্লাবের সম্পাদক নিশীথবাবু এরিয়ানকে উপেক্ষা করে, দক্ষিণ কোরিয়াই যে আই এফ এ শিল্ডের সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তা তিনি সহজেই জেনে ফেলেছেন। সেই জন্যই তিনি দক্ষিণ কোরিয়া ও ইস্টবেঙ্গলের প্রদর্শনী খেলার টিকিট আগে থাকতেই সদস্য-দের কাছে বিলি করতে চেয়েছেন। এরিয়ানকে এত হেয় করার কোন কারণ নেই। তিনি কি

পাঠকের কলমে

গণৎকার যে আগে থাকতেই এই খেলার ফলাফল বলে দিলেন ? আমার বক্তব্য, আগ বাড়িয়ে নিশীথবাবুর এইরূপ মন্তব্য করা উচিত হয়নি। আশাকরি ভবিষ্যতে তিনি নিশ্চয়ই তার দোষ স্বীকার করবেন।

তিমির বরণ বাজাড়,
গ্রাঃ + পোঃ—পোদড়া, জেলা—হাওড়া।

'শারদীয়া' সংখ্যা হলে 'ঈদ' সংখ্যা নয় কেন ?

আমি খেলার আসরের জন্ম থেকে নিয়মিত পাঠক, প্রতিটি সংখ্যা আমার 'এস' টোরি 'রুমে' সাজিয়ে রেখেছি কিন্তু কোন দিন পত্রিকার মধ্যে এতটুকু ইংগিত পাইনি যে খেলার আসর একটি ধর্মীয় পার্টির পত্রিকা, কিন্তু যখন বাসন্তী পূজা বলুন, দুর্গা পূজা বা শারদীয়া পূজার আগমন হয়, তখন কেমন যেন খটকা লাগে। তখন এই পত্রিকার নাম হয় 'শারদীয়া খেলার আসর'। তা হোক, তাতে আমার, আমার কেন কোন পাঠকের বিন্দু বিসর্গ আপত্তি থাকতে পারে না এ কথা হলফ করে বলা যায়। কারণ এ উৎসব সকল বাঙালীর উৎসব। আমরা প্রবাসীরা দেশে ফিরে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাই।

সারা বছরের বিভেদ ভুলে বাঙালীরা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, পিতা-মাতা, ভাই-বোন প্রভৃতির সঙ্গে যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম, আশীর্বাদ ও আলিঙ্গন করে থাকেন। দুর্গাপূজা বাঙালীর জাতীয় পূজা।

কিন্তু প্রিয় মহাশয়, একটা প্রশ্ন প্রতি বছর এই সময় আমার বিবেককে বার বার জিজ্ঞাসা করে যদিও খেলার আসর কোন ধর্মীয় পত্রিকা নয়, তাহলে এই পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয় কেন ? যদি তাই হয়, তাহলে এই পত্রিকা 'ঈদ' সংখ্যা নামে প্রকাশিত হয় না কেন ?

সত্যি বলতে কি, আমি আমার বিবেককে এই প্রশ্নের সদুত্তর আজও দিতে পারিনি। তাই দীর্ঘ আশা নিয়ে এবং সদুত্তরের আশায় আপনার দ্বারস্থ হলাম।

মোঃ আবদুল গফফার লস্কর
কুশাডাঙ্গা, হাওড়া।

শিবাজী দাশগুপ্তর মত ধারাভাষ্যকার কি আর নেই ?

১৯৭৯-র লিগ ও ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্ড নিজেদের নৌকায় তোলার জন্য মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

তবে যে প্রসঙ্গে লেখা তা হলো, ধারা-ভাষ্য। গত রবিবার সুদূর দিল্লিতে বসে আমাদের একবারের জন্যও মনেই হচ্ছিল না



যে আমরা প্রবাসে বসে 'রিলে' শুনছি। মনে হচ্ছিল আমরা কল্পনার মানস চক্ষে মোহন-বাগান মাঠে হাজার হাজার দর্শকদের মাঝে বসে খেলা দেখছি। এত সুন্দরভাবে বলের দ্রুত গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাবলীল ধারায় শিবাজী দাশগুপ্ত ও তার সহযোগী ইংরাজীতে যে ধারাবিবরণী দিয়েছেন, তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। এজন্য ওদের জানাবেন আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

তবে এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করছি। শিল্ডের একটি খেলায় (সম্ভবত মোহনবাগান বনাম বি এন আর) এক মহিলা কণ্ঠে (শ্রীরূপা দেবী) ধারাবিবরণী শুনলাম। মনে হচ্ছিল তিনি রান্নাঘর থেকে 'খুন্তি' হাতে 'কমেন্ট'রি বক্সে' ঢুকেছেন এবং বলের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না। অনেক পেছনে পড়ে যাচ্ছিলেন আর বারবার অন্যমনস্ক হয়ে একই কথা বারবার বলছিলেন (মনে হয় বারবার রান্নাঘরের কথাই ভাবছিলেন, এই বুঝি তরকারী পুড়ে গেল)।

সারা ভারতের অগণিত খেলা-পাগল বাঙালী আছেন যারা বেতার ভাষ্যের মাধ্যমেই খেলা দেখার সখ চরিতার্থ করেন। তাই কর্মকর্তাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, তারা যেন বড় খেলায় অন্তত অভিজ্ঞ ধারাভাষ্যকারদের-নিয়োগ করেন।

দীপু চৌধুরী, রতন দত্ত ও স্বপন দাস
রেসকোর্স, নিউদিল্লি-১১০০০৩।

ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে

সম্প্রতি ভারতে বিশেষত পশ্চিমবাংলায় ক্রিকেটকে ঘিরে যে সমালোচনা হচ্ছে, তা খুবই দুঃখজনক। স্বার্থান্বেষী মহল থেকেও ক্রিকেটের বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উত্থাপিত হচ্ছে। তারা যদি শুধুমাত্র ভারতীয় ক্রিকেট-বিদ্বেষীই হন—তবুও আমি বলতে চাই যে যোগ্যতা আছে বলেই ভারতীয়রা ক্রিকেট খেলছে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসরে নামতে পেরেছে। পৃথিবীর খুব কম সংখ্যক দেশ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে থাকে বলেই তাতে ভারতের গুরুত্ব রয়েছে এবং পুরোপুরি লড়তে পারছে। জোর দিয়ে বলা যায়, সকল জয়-পরাজয়ের ঊর্ধ্বে ক্রিকেটকে যথাযথ মর্যাদা দান এবং তার সদ্ব্যবহারই ভারতীয় ক্রিকেটকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। একথাও বলা অবান্তর যে ক্রিকেটে অযথা সময় নষ্ট এবং অর্থের অপচয় হয়। আশা করি, ক্রিকেটের জন্য ব্যয়িত সময়ের মূল্য দেবার মত সমাজ বা জাতির এখনও উদ্ভব হয়নি অবশ্য ব্যক্তি বিশেষের কথা আলাদা। উপরন্তু ক্রিকেটের কল্যাণে আমাদের দেশের ছাত্র সমাজ এবং কর্মহীন যুব সমাজের অধিকাংশই বছরের পাঁচ-ছয় মাস সম্পূর্ণ ভবঘুরে জীবন-যাপনের হাত থেকে রক্ষা পায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন খেলাতে ক্রিকেটের চেয়ে শতগুণ অর্থ বেশী ব্যয় হচ্ছে। ভারতে ক্রিকেটের পিছনে যে অর্থ বরাদ্দ হয়, তা এই জনবহুল দেশের কল্যাণে খুবই নগণ্য, যা সদ্ব্যবহারের কর্মপন্থার বাস্তবায়ন যুক্তিহীন, কেননা এর চেয়ে শতকোটি গুণ বেশী অর্থ পরোক্ষভাবে অপচয় হচ্ছে। সবশেষে একটি আবেদন—ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নকে গৌণ মনে করে এবং অগণিত ক্রিকেট-প্রেমীদের বিরুদ্ধাচরণ না করে ক্রিকেটকে সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখুন।

অনীশ রায়, খাসপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

এ কোন্ ইস্টবেঙ্গল

আমি একজন ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। ১৬ সেপ্টেম্বর আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে ভারত-বিখ্যাত ফুটবল তারকাদের সমাবেশ সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গলকে মোহনবাগানের হাতে যেভাবে বিধ্বস্ত হতে দেখলাম তা বেশ কয়েকবছর চোখে পড়েনি। এর কারণ সহজবোধ্য, ভিনরাজ্যের ও এ রাজ্যের খেলোয়াড়দের মধ্যে দলের তাগিদে সংহতি ও আন্তরিকতার অভাব। এরা হয়ত প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে উত্তীর্ণ কিন্তু তাতে দলগত সাফল্য আসে না। গত নাগজী, স্ট্যাফোর্ড এবং সম্প্রতি আই এফ এ শিল্ডে ইস্টবেঙ্গলের পরাজয় এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পর পর ছ'বছর লিগ ও অন্যান্য ট্রফিতে ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যে কর্মকর্তারা এতই বিভোর হয়েছিলেন যে লঘু পাপে গুরুদণ্ড পেয়ে দলত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই সাফল্যের নায়ক সুধীর, গৌতম এবং অশোকলালরা। এ বছর দলের ব্যর্থতার কোপ গিয়ে পড়ল ঠাণ্ডা মাথার মানুষ কোচ অরুণ ঘোষের ওপর। টাকা খরচ করে বাইরের খেলোয়াড় আনিয়ে দায়িত্ব শেষ করলেই যে ট্রফি ঘরে আসে না আশাকরি ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের এবার সেটি বোধগম্য হয়েছে। তাই ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের অনুরোধ করছি তারা যেন আভ্যন্তরীণ বিবাদ, দলবাজী ভুলে গিয়ে আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা লড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্মান পুনরুদ্ধার করে লক্ষ লক্ষ সমর্থকের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তোলেন।

প্রদীপ সরকার,
বকুলতলা লেন, পুরুলিয়া।

দেবদাস-পার্বতী

গত ১৬ সেপ্টেম্বর শিল্ড ফাইনাল খেলার ধারাবিবরণী শোনার পর মনে পড়ে গেল, পার্বতী দেবদাসকে প্রশ্ন করেছিল—'নদীতে কতো জল, অতো জলেও কি কলঙ্ক মুছে যাবে না?'

শর্বরী দাস, ধানবাদ, বিহার।

এমন আচরণ কেন ?

২৫ আগস্ট প্রিয় দল মোহনবাগান বার্নপুর ইউনাইটেড ক্লাবের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে বার্নপুর ফুটবল মাঠে। আমি ওই খেলার দিন সকালবেলায় বর্ধমান থেকে বার্নপুরে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়ে কোন-রকমে টিকিট জোগাড় করি, প্রায় সাড়ে ৩টা নাগাদ খেলা শুরু হয়। খেলা শুরুর আগে বার্নপুর দল মোহনবাগানকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। মোহনবাগান খেলোয়াড়রা সেই ফুল দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দেন। আমি সখ করে মাঠের ভেতরে বসেছিলাম, উঠে গিয়ে উলাগাদার হাত থেকে ফুলের তোড়াটি নিয়ে আসি, আর সেই থেকে শুরু হয় কিছু দর্শকের নানা অশ্লীল মন্তব্য, কেউ কেউ আমার থেকে ফুলটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। আমি নীরব ছিলাম! কারোর কারোর মানবিকতা বোধ কত কম তাই শুধু মাঠে বসে ভাবছিলাম। ছেলেরা মাঠে গিয়ে খেলোয়াড়দের গালাগালি দেয়,মার ধোর করে,অসভ্যর মত ব্যবহার করে সেটা দোষের,না কোন মেয়ে সৌজন্য সহকারে বোনের আব্দারে খেলোয়াড় দাদার কাছে ফুল আনতে গেছে সেটা দোষের?

কবিতা দত্ত, ইছলাবাদ কলোনী, বর্ধমান।

মেয়েরা মাঠে কেন ?

(১)

৩১ আগস্টের পাঠকের কলমে 'মেয়েরা মাঠে কেন' পড়ে ভাল লাগল। তবে সব মেয়েই যে ফ্যাশনের জন্য মাঠে যান, তা ঠিক নয়। আমরা যারা খেলা কিছুটা বুঝি তারা টিকিটের অভাবে মাঠে যেতে পারি না। তার থেকে বড় ব্যাপার মাঠের মাঝে যে সমস্ত কাণ্ড ঘটে তারজন্য বাড়ি থেকে অভিভাবকরাও ছাড়তে চান না। কিন্তু সাত সকালে যেসব মেয়েরা মাঠের মাঝে গিয়ে উপস্থিত হন , তা সত্যি দৃষ্টিকটু। আমার মতে যারা খেলা বুঝতে চান, তারা ছোট টিমের খেলা দেখে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন। এবং তার সঙ্গে বই পড়াও দরকার হয়। আমাদের অর্থাৎ সারা বাংলার মেয়ে সমষ্টির তরফ থেকে একান্তভাবে, সেই-সব মেয়েদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন সকালবেলা মাঠে গিয়ে খেলোয়াড়দের খেলার মনোভাব নষ্ট না করেন। তাতে আপনাদেরও সম্মান বাড়বে তথা সারা বাংলার মেয়েদের মান বাড়বে আশাকরি।

চন্দনা বসু, বাগবাজার।

(২)

৩১ আগস্ট 'মেয়েরা মাঠে কেন?' শিরোনামে যে চিঠি 'পাঠকের কলমে' প্রকাশিত হয়েছে মেয়ে হয়ে জন্মে সে চিঠির প্রকৃত জবাব না দিয়ে পারলুম না। সঞ্জয়বাবুর ওই ট্যাংরায় কবে কোন কোচ গিয়েছিলেন তাতে আমাদের কোন দরকার নেই। তবে ওঁর মনে রাখা উচিত ছেলেরা যে উদ্দেশ্যে প্র্যাক-টিস দেখতে যায় মেয়েরাও সেই উদ্দেশ্যেই যায়। প্লেয়ারদের তাদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য নয়। আমরা কোন মরশুমেই ইস্টবেঙ্গল বা অন্য কোন দলের প্র্যাকটিস দেখতে যাইনি। তবে মেয়ে হয়ে এ অপমান সহ্য করতে না পেরেই কলম চালু করতে বাধ্য হলাম। সাব্বির আলির বাঁ পায়ের সটের জোর কম। তাই উনি উপস্থিত দর্শকদের (পুরুষ ও মহিলা) সামনে সট নিতে লজ্জা পান। মেয়েদের উপস্থিতির জন্য নয়। এমন যদি হয় যে সাব্বির বাঁ পায়ে সট নিলে অবধারিত গোল উনি কি তখন মেয়ে দর্শকদের কথা ভেবে একটি গোল থেকে ইস্টবেঙ্গলকে বঞ্চিত করবেন? পত্রলেখক যেসব কথা উল্লেখ করেছেন, তা সাময়িক উত্তেজক হলেও শোভন নয়। তাই লিখছি এসব কথা একটু ভেবে চিন্তে লিখবেন। মনে রাখবেন আমরা মানে মেয়েরা এসব অপমান চুপ করে সহ্য করব না, প্রতিবাদ করবই।

সুজাতা চক্রবর্তী, দোলনচাঁপা ঘোষ,
শবনম ব্যানার্জি, ইন্দ্রাণী রায়,
যাদবপুর, কলকাতা-৩২

একই বক্তব্যের চিঠি পাঠিয়েছেন কলকাতার রীণা দাস, মধুমিতা চন্দ ও মহুয়া বসু; দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে জয়া, তাপসী, নন্দিতা, সোনালী বন্দ্যোপাধ্যায়; চন্দননগর, সূচনা বিশ্বাস, শ্রাবণী ও মৌসুমী ব্যানার্জি ও চৈতালী মিত্র, বালী; চন্দ্রিকা ও সীমা সরকার, হাওড়া; পিয়া চক্রবর্তী ও প্রায় ৩৯ জন, খড়দহ; রুমু কুণ্ডু, রানু দত্ত, শিখা ও শম্পা ব্যানার্জি, ও আরো অনেকে।



আসামের ডুগার শিল্ডে (ফুটবল) উৎসাহী দর্শকদের একাংশ / লক্ষ্মণ পোদ্দার

নকুল মুখার্জি বুট পরে খেলতেন

খেলার আসর শারদীয় সংখ্যায় 'জামশেদ-পুরে খেলাধুলার ইতিহাসে বাঙালীরা' শীর্ষক রচনায় এক জায়গায় লেখা আছে যে, 'গোষ্ঠ পালের সমসাময়িক যুগে নকুল মুখার্জি খালি পায়ে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলেছেন।' নকুল মুখার্জি বুট পরে মোহনবাগানের হয়ে খেলতেন। উপরোক্ত তথ্য ঠিক নয়।

শ্যামল শীল।

ভারত-ইংল্যাণ্ড চতুর্থ টেস্ট প্রসঙ্গে

সদ্যসমাপ্ত ভারত—ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ টেস্টের শেষ মুহূর্তে যে নাটকীয় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান এক বল বাকী থাকাকালীন, খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে অধিনায়কদ্বয় চরম নির্বুদ্ধিতার ও ক্রিকেট অজ্ঞতার পরিচয় রেখেছেন। কারণ ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা। যদি এটাই সত্যি বলে মেনে নিতে হয় তাহলে আমার মতে সেই এক বলেও হার-জিত হতে পারত।

উদাহরণ স্বরূপ: যদি শেষ বলটি নো বল হত এবং কোন এক ব্যাটসম্যান রান আউট হত এবং শেষ করতে পারার সুবাদে বোলার ভারতের শেষ তথা অন্তিম উইকেটটি যদি ফেলে দিত? সেক্ষেত্রে কি ভারত হারত না?

যদি সেই 'নো' বলটিতে ভারত একটি চার করে নিত এবং পরবর্তী বলে আরও একটি উইকেট হাতে থাকা অবস্থায় ভারতীয় ব্যাটস-ম্যানরা ওভার বাউণ্ডারির চান্স নিল এবং কৃতকার্য হল। তাহলে কি ভারত জিতে সিরিজ ড্র করে আসত না?

মাঠু গাঙ্গুলি ও সুবীর সেনগুপ্ত
জামালপুর, মুঙ্গের।

ক্রিকেট শেখানো হোক

আজকে খেলার আসর আমার একটা প্রিয় পত্রিকা যা সমস্ত খেলা সম্বন্ধীয় বিষয়কে আমাদের কাছে পরিষ্কার তুলে ধরে কিন্তু আমার প্রিয় খেলা ক্রিকেটকে কিছুটা পেছনেই ফেলে রেখেছে মনে হয়। তাই আমার ইচ্ছা যে ফুটবলের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটের শিক্ষা দিলে আনন্দ পেতাম।

সুনীল সেনগুপ্ত, ঘাটশিলা।

অভিনন্দন মোহনবাগানকে

সাবাস মোহনবাগান—সাবাস। অভিনন্দন জানাই মোহনবাগানের প্রতিটি খেলোয়াড়কে, প্রশিক্ষক পি কে-কে এবং কর্মকর্তাদিগকে এবং আলাদা করে আর একজনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি,সে হলো—গৌতম সরকারকে, দারুণ খেলেছে মোহনবাগান—দারুণ, ১৬ তারিখ আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে। বাংলা থেকে ভালো ফুটবলার যে মুছে যায়নি তার প্রমাণ মোহনবাগান। ৭৯-র লিগ ও শিল্ড-এ তাদের সাফল্যই তার প্রমাণ। লিগ ও শিল্ড পেয়েছে বলেই তাদের সাফল্যের বিচার করছি না। এ মরশুমে প্রতিটি খেলায় সত্যিই তারা ভীষণ ভালো খেলেছে। আশা করি, এবার কলকাতার অপর দুই বড় ক্লাবের চোখ খুলবে (অবশ্য চোখ থাকলে)। মোহনবাগানের এই সু-সময়ে যার কথা সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে সে হলো বঞ্চিত অধিনায়ক দিলীপ পালিত। অবশ্য এটা আমার ভাববার বিষয় নয়।

আমি কলেজের ছাত্র ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের গোড়া সমর্থক (অন্ধ না)। আশা করি, ইস্টবেঙ্গল সমর্থকগণ আমাকে ভুল বুঝবে না।

অমিত দত্তগুপ্ত
কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

সঠিক খবর দিন

২৪ আগস্ট সংখ্যাটিতে 'রীতা আদর্শ গৃহিণী' লেখাটি পড়লাম। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই কিভাবে আপনার মত একজন অভিজ্ঞ সম্পাদক এই ধরনের ভুল ছাপিয়ে পত্রিকাটিকে সমালোচনার সম্মুখীন করে তুলছেন। লেখাটিতে পেলাম—রীতার বিয়ে হয় '৭৫ সালের জুলাই মাসে। এদিকে তার ৮ বছরের মেয়ে ঝুম্পি (সুমিতা) রীতাকে ভালবাসে এবং সর্বদা মায়ের শুভ কামনা করে। আমার মূল বক্তব্য যেখানে রীতা সেনের বিয়ে হয়েছে মাত্র ৪ বছর ১ মাস আগে সেখানে তার ৮ বছরের মেয়ে হয় কি করে। আর বেশী গভীরে না গিয়ে আমি শুধু জানতে চাই রীতা সেন কি ঝুম্পির সৎ মা, নাকি এটা প্রিন্টিং মিসটেক অথবা অন্য কোন ব্যাপার আমাদের ধরে নিতে হবে। আশাকরি পাঠকবর্গের কাছে এই ধরনের ভুল প্রকাশ করবেন না।

রতন বসু, ৩/৫২, বিদ্যাসাগর
কলকাতা-৭০০০৪৭

[কুমারী ঝুম্পি (সুমিতা) আশীস সেন-এর কন্যা—সম্পাদক]

চিঠিপত্র কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখবেন। মনে রাখবেন দু'পৃষ্ঠায় লেখা চিঠি ছাপান সম্ভব নাও হতে পারে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবেন না, চিঠি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লিখবেন। গঠনমূলক সমালোচনা কাম্য কিন্তু কখনও ব্যক্তিগত কোন বিষয় আলোচনায় স্থান পায় না। চিঠির উপরে অবশ্যই 'পাঠকের কলমে' উল্লেখ করবেন। তা না হলে ওই চিঠি সময়মত পাওয়া যায় না।

চিত্তরঞ্জনে ক্রশ- কাণ্ট্রিতে গোপাল সাইনির আচরণ সকলকে অবাক করেছে



চিত্তরঞ্জনে ক্রশকাণ্ট্রি দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন ইস্টার্ন রেলের মেয়ে দল ঃ পিছনে বাঁদিক থেকে—প্রতিমা দাস, বীণা দত্ত, সিদ্ধেশ্বরী হালদার, কোচ সুজিত সিংহ, মিনতি দাস ও ছবি সাউ। সামনে—সুজাতা দাস, পূর্ণিমা দাস, কৃষ্ণা দাস, পূরবী দাস ও জ্যোৎস্না গরাই

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ আমি যা বলতে যাচ্ছি তার বিষয়বস্তু হল আন্তঃরেলওয়ে ক্রশকাণ্ট্রি প্রতিযোগিতা, যা চিত্তরঞ্জনে হয়ে গেল। প্রতিযোগিতার শেষের দিকে একটি বাচ্চা ছেলে একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীর পেছনে পেছনে এই বলতে বলতে যাচ্ছে 'আমাকে প্রাইজটা দিন, প্রাইজটা দিন, একদম ভাঙ্গবেন না।' কিন্তু প্রতিযোগীটি রাগতভাবে ছেলেটির দিকে একবার তাকিয়ে তার প্রাইজটি দুমড়ে রাস্তায় ফেলে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি তা কুড়িয়ে নিয়ে দুঃখের সঙ্গে বললো, 'আপনি প্রাইজটা ভেঙ্গে ফেললেন তবুও আমাকে দিলেন না।'

এই প্রতিযোগী হচ্ছেন বিখ্যাত গোপাল সাইনি, যিনি সম্প্রতি টোকিওতে 'এশিয়ান ট্র্যাক এ্যাণ্ড ফিল্ড' মিটে এবং ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে মেডেল পেয়েছেন। চিত্তরঞ্জনে আসার কয়েকদিন আগে কানাডায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় অন্যান্য এশিয়ান খেলোয়াড়দের মতন সর্বশেষ স্থান অধিকার করেন। তিনি প্লেনে দিল্লি হয়ে কলকাতায় আসেন এবং চিত্তরঞ্জনে উপস্থিত হয়ে প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। কিন্তু তিনি সাউথ সেণ্টার রেলওয়ের প্যারা সিং নামক একজন সাধারণ প্রতিযোগীর কাছে পরাজিত হন। প্যারা সিং খুবই ভাল সময়ে দৌড়েছেন। গোপাল সাইনির এই অখেলোয়াড়ী মনোভাব আমরা কেউ আশা করিনি। এবার এই প্রতিযোগিতায় যা আয়োজন করা হয়েছিল তা গত বছরের টাটা বা উদয়পুরের আয়োজন অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের।

এই প্রতিযোগিতা হবার বেশ কিছুদিন আগে ইস্টার্ন রেলওয়ের কোচ সুজিত সিংহকে দেখা গেল এই চিত্তরঞ্জনে। শুনলাম তাকে এখানে আনানো হয়েছে আধুনিক ক্রশকাণ্ট্রি দৌড়বার রাস্তা ও আনুসঙ্গিক টেকনিক্যাল বস্তুগুলি যা পরিপূর্ণ ক্রশকাণ্ট্রি রেস করতে সাহায্য করে, সেই সব কর্মসূচীগুলির বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য।

ছেলেদের ক্রশকাণ্ট্রি রেস যেটার দূরত্ব ১৪ ১/২ কি মি তার শতকরা ষাট ভাগ ছিল গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে। ছোট ছোট উঁচু নীচু টিলা, কাঁচা মাটি, কাঁকর মাটি বা নালা এবং আলক্ষেতের মধ্য দিয়ে এই রাস্তা প্রসারিত ছিল। কাতারে কাতারে লোক মিহিজামের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেন। এই রাস্তা দিয়ে যারা দৌড়চ্ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত ক্রশকাণ্ট্রি দৌড়বীর নর্দান রেলের কুলবীর সিং, দশনদা সিং, দর্শন সিং, সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ের মহম্মদ ইউসুফ, এল ফ্রাসন্স, গুরমেল সিং, প্যারা সিং, সাদার্ন রেলওয়ের সুব্রামণি, ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের গোপাল সাইনি, তেজপাল সিং, বালুরাম এবং ইস্টার্ন রেলের ডি নস্কর ও কার্তিক মণ্ডল। তারপর তারা একে একে ওভলে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন এবং এক চক্কর মেরে ওদের প্রতিযোগিতা শেষ করেন। কিন্তু তখন দেখা গেল দর্শকদের সংখ্যা অতি অল্প।

২ আগস্ট সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে চিত্তরঞ্জনের সি. এম. ই (ওয়ার্কস) অরুণ মুখার্জির উপস্থিতিতে এক মনোরম পরিবেশে ইস্টার্ন রেলের ব্যাণ্ডের তালে তালে পতাকা উত্তোলন ও শপথ গ্রহণ করা হল। এরপর ঠিক সকাল সাতটার সময় মহিলাদের তিন কিলোমিটারে ক্রশ কাণ্ট্রি রেস আরম্ভ হল। মেয়েদের গ্রূপে পুরনো এ্যাথলিটদের মধ্যে প্রায় সবাই যোগ দিয়েছিলেন। যেমন ইস্টার্ন রেলের সিদ্ধেশ্বরী হালদার, ছবি শাহু, পূর্ণিমা দাস, সাউথ ইস্টার্নের উমা দাস, শ্যামলী গণ, ইন্দু মিশ্র, এ্যাগনিস গোমেজ, সাউথ সেণ্টাল রেলের কৃষ্ণা বসু প্রমুখ।

কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য এ্যাথলিট দু' একজন আসেননি—যেমন সাউথ ইস্টার্ন রেলের জলজা নরেশ, সদ্য বিবাহিতা নদার্ন রেলের শশীকলা মণি। একজন মহিলা অফিসিয়াল স্টার্টার স্টার্ট দিলেন। কিন্তু স্টার্ট দেবার উক্তিতে ভুল থাকার জন্য যেমন তিনি গুনতে আরম্ভ করে ১ পর্যন্ত গোনার পর ফায়ার করলেন। কিন্তু সাধারণত ১ পর্যন্ত গোনার দরকার হয় না। ২ গোনার পরই ফায়ার করা হয়। তার ফলে কয়েকজন স্টার্টিং-এ বক্স ইন হয়ে যান।

পুরুষদের বেলায় একই ভুল হয়। যেমন 'অন ইয়োর মার্ক' বলার পর ফায়ার করা হয়, সেট কথাটি বলার দরকার হয় না। কিন্তু স্টার্টার 'সেট' কথাটি বলার পর ফায়ার করেন। তাতে যদিও স্টার্টিং-এ কোন গোলমাল হয়নি, তবে অফিসিয়ালদের এ ব্যাপারটা ভালভাবে জানা উচিত। এতে ভবিষ্যতে এ্যাথলিটদের সুবিধা হবে।

এই প্রতিযোগিতায় মেয়েদের মধ্যে সাউথ ইস্টার্নের উমা দাস প্রথম হন। যতদিন থেকে ক্রশকাণ্ট্রি জাতীয় পর্যায়ে আরম্ভ হয়েছে প্রায় তখন থেকেই তিনি যোগদান করে আসছেন এবং অধিকাংশ সময়েই প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার ৮ সেকেণ্ড পর ইস্টার্ন রেলের ছবি সাউ দ্বিতীয় হয়ে দৌড় শেষ করেন। এরপর আসেন সাউথ ইস্টার্নের শ্যামলী গণ। তারপর দল বেঁধে রেস শেষ করলেন ইস্টার্ন রেলের আটজন মেয়ে।

পুরুষ

প্রথম—সাউথ সেণ্টার রেল	৫৬ পয়েণ্ট।
দ্বিতীয়—ওয়েস্টার্ন রেল	৬০ পয়েণ্ট।
তৃতীয়—নর্দার্ন রেল	৮০ পয়েণ্ট।
চতুর্থ—ইস্টার্ন রেল	১৩০ পয়েণ্ট।

মেয়ে

প্রথম—ইস্টার্ন রেল	৩২ পয়েণ্ট।
দ্বিতীয়—সাউথ ইস্টার্ন রেল	৭২ পয়েণ্ট।
তৃতীয়—ওয়েস্টার্ন রেল	৯৯ পয়েণ্ট।

সুজিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, এবার বাংলার মেয়েরা ভাল করেছে। আশা করা যায় ইস্টার্ন রেলের

৭ জন ও সাউথ ইস্টার্ন রেলের ২ জন মেয়ে ন্যাশানাল গেমস-এর জন্য মনোনীত হবেন। চিত্তরঞ্জনের ছেলেরাই কেবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। মেয়েদের কোন দল ছিল না। চিত্তরঞ্জনের স্পোর্টস অর্গানাইজার এস কে লাহিড়ীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এখানকার মেয়েরা খেলাধুলায় তত উৎসাহী নয়।

ছেলেমেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সমস্ত চিত্তরঞ্জন জুড়ে।

প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর সকাল ৯টার সময়ে পুরস্কার বিতরণ শুরু হয়। চিত্তরঞ্জনের জেনারেল ম্যনেজার কে রমণ বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা ভারতের মুখ উজ্জল করেছে। তিনি ইস্টার্ন রেলের ব্যাণ্ডবাদ্যকারদের অর্থ দ্বারা পুরস্কৃত করেন। শ্রীমতী রমণ পুরস্কার বিতরণ করেন। ●

রাঁচীতে এখন ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিহারের শৈল শহর রাঁচিতে এখন শুধু ফুটবল আর ফুটবল। শেষ হয়েছে ওয়াই এম সি এ মিনি ফুটবল, দাদু পি বি সিং স্মৃতি ফুটবল, মুরির ঐতিহ্যশালী আর্সেনল শিল্ড

গত বছর অভূতপূর্ব সাফল্যের পর রাঁচি ওয়াই এম সি এ এবারও মিনি ফুটবলের আসর বসিয়েছিল স্থানীয় সেণ্ট পলস স্কুল মাঠে। ১১ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৪৪টি দল এই প্রতিযোগিতায় খেলে। যাদের বয়স বারো বছরের কম তারাই এই প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পেয়েছে। সেমিফাইনালে বাবুলাইন শান্তি ক্লাব সেণ্ট পলস মিডল স্কুলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অপর সেমিফাইনালে সেণ্ট পলস হাই স্কুল নেতাজী ক্লাব কাঁটা-টোলিকে ওই একই ফলে হারায়। ফাইনালে সেণ্ট পলস হাই স্কুল শান্তি ফুটবল ক্লাবকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতার পর ৩-২ গোলে হারিয়ে শিল্ড বিজয়ী হয়। ভাল খেলে ও দু'দুবার এগিয়ে থেকেও শান্তি ক্লাবের পরাজয় তাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় দেয়। সেণ্ট পলসের পক্ষে আজ দুটি গোল করে অধিনায়ক বিজয় কিস-পোটটা ও একটি সুনীল নাগ। শান্তি ক্লাবের গোলদাতা বিজয় খেস ও সুচিত টোপপো। শান্তি ক্লাব তাদের পুরস্কার গ্রহণ করেনি। কারণ হিসাবে তারা জানায়—বিজয়ী দলের বিমল টিরকি বি বি সি দলের পক্ষে এই প্রতিযোগিতায় এর আগে খেলেছে এবং সেণ্ট পলসের দশম শ্রেণীর ছাত্র সুনীল নাগ বয়স সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।

নিউ এ জি কলোনীতে পি বি সিং স্মৃতি ফুটবল শেষ হয়েছে। বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে বি ওয়াই সি টি ক্লাব। তারা উদ্যোক্তা দল স্টুডেণ্টস ক্লাবকে ৩-২ গোলে হারায়। স্টুডেণ্টস ক্লাবের লিংকম্যান অধীর চ্যাটার্জি প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছে। লিগ কাম নক আউট এই প্রতিযোগিতায় ছ'টি বিভাগের বিজয়ীরা কোয়ার্টার ফাইনাল লিগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

মুরী ইণ্ডাল ওয়েলফেয়ার সেণ্টার আয়োজিত আর্সেনল শিল্ডে ফুটবলের আসর বসেছিল স্থানীয় ফ্যাক্টরি ময়দানে। অংশ নিয়েছিল রাঁচি, লোহারদাগা, জামসেদপুর, পুরুলিয়া, মুরি, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানের ১৫টি দল। ফাইনালে রাঁচি ইলেকট্রিসিটি বোর্ড স্থানীয় ছোটনাগপুর বুজ দলকে ২-০ গোলে হারিয়ে এই প্রথমবার শিল্ড জয়ের গৌরব লাভ করেছে। রাঁচি বিদ্যুৎ সংস্থার পক্ষে উভয় অর্ধে দুটি গোল করে লুইস টোপনো।

কবাডির দলবদলে দুই রেলের শক্তি সমান সমান

স্টাফ রিপোর্টার : ১৫ থেকে ৩১ আগস্ট কবাডি খেলোয়াড়দের দলবদল হল রাজ্য সংস্থার তাঁবুতে। পৌনে দু'শর মত খেলোয়াড় এবার নাম নথিভুক্ত করেছে দল পরিবর্তনের তালিকায়। পুরুষ দলগুলোর মধ্যে দুই রেল (ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্ন) তাদের শক্তি মোটামুটি একই রেখেছে। উপরি পাওনা হিসাবে ডক থেকে তিনটি ছেলে তুলে নিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। এবছর নতুন করে সেজেছে কলকাতা অলরাউণ্ডার ও সরস্বতী হা-ডু-ডু ক্লাব। এবছর বেশ মজবুত দল ওরা গড়েছে। পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফের দক্ষ খেলোয়াড় অমরেশ রায় চব্বিশ পরগণায় সই করে আবার তার নিজের দলে ফিরে যায়।

মেয়েদের বিভাগে পাল্লা বদলের হিসাব-নিকাশ শেষে দেখা গেল নতুনবাজার অশোক সংঘ, কলকাতা খো-খো অ্যাণ্ড হা-ডু-ডু, এরিয়ান ও অলরাউণ্ডার দল আগামী মরশুমে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সম্মান দখলের জন্য। চারটি টিমই বেশ শক্তিশালী হয়েছে। অন্যদিকে মহমেডান এ সি এবছর যথেষ্ট শক্তিহীন হয়েছে। তেমন কোন নতুন খেলোয়াড় যে ওরা সংগ্রহ করতে পারেনি তাই নয়, পুরোনো অধিকাংশ খেলোয়াড়ও দলত্যাগ করে নদীয়া জেলা দলে ভিড়েছে। দলবদলের শেষদিন ওদের জন্য আরও বড় আঘাত অপেক্ষা করছিল। ভবানী সাধুখাঁ টিম ছেড়ে দিয়ে ওর পুরোনো ক্লাব কলকাতা খো-খো অ্যাণ্ড হা-ডু-ডু-তে নাম লিখিয়েছে।

প্রথমদিকে চমক সৃষ্টি করেছিল মণিকা নাথ। মহমেডানের পক্ষে ও নাম সই করেছিল। কিন্তু পরে মণিকা ওর পুরোনো দল অশোক সংঘের অনুকূলে নাম প্রত্যাহার করে নেয়। এছাড়া অশোক সংঘ তুলেছে লক্ষ্মী সাহাকে। এরিয়ান ও অলরাউণ্ডার ক্লাব হুগলী জেলা দলের কয়েকজন মেয়েকে পেয়েছে। অলরাউণ্ডার চব্বিশ পরগণা থেকেও ঘরে এনেছে কিছু মেয়ে। ক্যালকাটা খো-খো অ্যাণ্ড হা-ডু-ডু ক্লাবের রঞ্জনা ব্যানার্জি প্রথম দিন অশোক সংঘের পক্ষে সই করলেও পরদিনই উইথড্র করে নেয়। জেলা পর্যায়ে লক্ষ্য করা গেল শেষ পর্যন্ত চব্বিশ পরগণা ও হুগলী বেশ কয়েকটি মেয়েকে হারিয়ে অনেকটা কমজোরী হয়ে পড়েছে। তবে জেলায় নতুন মুখের সংখ্যা অনেক। তাই, আশা করা যায় সেই নতুন মুখগুলির দ্বারা ওই ক্ষতিটা অনেকটা পুষিয়ে নিতে পারবে।

এবারের দলবদলের দিনগুলিতে কবাডি টেণ্ট বেশ সরগরম ছিল। শেষদিন প্রচুর ভিড় হয় এবং কর্তৃপক্ষকে সবকিছু ঠিকঠাক সম্পন্ন করতে বেশ হিমসিম খেতে হয়। জুনিয়র ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। হাওড়া জেলার মেয়ে দল এবার অনেকাংশে ভেঙে পড়েছে।



কবাডির দলবদলে নাম সই করছে ভবানী সাধুখাঁ, অনিতা ভাওয়াল, মৃণাল ঘোষ ও দীপিকা দত্ত/অক্ষয় নাগ দাস

দিল্লিতে সুব্রত কাপ খেলতে যাবে মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল

বাণীব্রত চৌধুরী ঃ অবশেষে সুব্রত কাপ খেলতে যাবার ছাড়পত্র পেল মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল। ৯ সেপ্টেম্বর কোচবিহারের এম জে এম স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলতি বৎসরের শ্রেষ্ঠ দল নির্বাচনের খেলায় ২-০ গোলে কলকাতার শ্রীগোপাল বিদ্যামন্দিরকে হারিয়ে মধ্যমগ্রাম কার্যত এই যোগ্যতা অর্জন করেছিল। কিন্তু মধ্যমগ্রামের বিরুদ্ধে নিয়মভঙ্গের লিখিত অভিযোগ এনেছিল বিদ্যামন্দির। বিদ্যামন্দিরের এই 'প্রতিবাদ' রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর না-মঞ্জুর করেছেন এবং মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলকেই এই রাজ্য থেকে এবছর সুব্রত কাপে অংশ গ্রহণ করবার ছাড়পত্রটি দিয়েছেন।

সুব্রত কাপ সম্পর্কে এই সংবাদ, আশা করা যায়, অনেক সংশয়ের অবসান ঘটাবে। কারণ এই খেলাকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি কয়েকটি সংবাদ-সংস্থা (খেলার আসর নয়) পরস্পর বিরোধী সংবাদ পরিবেশন করায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষভাবে মূল সুব্রত কাপের খেলা হয় প্রতি বছর দিল্লিতেই, পশ্চিমবঙ্গে নয়। রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ এই খেলায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্কুল দল নির্বাচন করে থাকেন। এই উপলক্ষ্যেই আন্তঃবিদ্যালয় পদ্ধতিতে ডঃ বি সি রায় শিল্ড ও কে পি মুখার্জি কাপ টুর্নামেন্ট চালু করেছেন রাজ্য সরকার ১৯৬১ সাল থেকে। স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই প্রতিযোগিতা উৎসর্গীকৃত।

আরো আনন্দের কথা, মূল প্রতিযোগিতাও এয়ার মারশাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাই এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ক নিছক আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই শেষ হয়ে যায় না, এটা স্কুল-পড়ুয়া ছাত্রদের কাছে বৎসরান্তিক বীরপূজাও বটে। পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব, অতএব অনেকের চাইতে বেশি।

ডুরাণ্ড ফুটবল কমিটি অনধিক ১৭ বছর বয়সী স্কুল ছাত্রদের জন্য এই 'সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট' আয়োজন করে আসছেন সেই ১৯৬১ সাল থেকেই। জাতীয় পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতায় প্রায় প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অংশগ্রহণ করায় আকর্ষণীয় টুর্নামেন্ট হিসেবে এই আন্তঃরাজ্য স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টটি 'লিটল ডুরাণ্ড' নামেও খ্যাত ও পরিচিত।



পরিচিতি ঃ সামনের সারি (বাঁদিক থেকে) শ্যামল ঘোষ, কৌশিক ব্যানার্জি, শিবনাথ পাত্র, স্বপনকুমার দফাদার, ভীমচন্দ্র নস্কর, বিশ্বনাথ সাধুখাঁ। মধ্যের সারি (বাঁ দিক থেকে) প্রদীপ সেনগুপ্ত, সুশান্ত ভট্টাচার্য (ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক), কৃষ্ণপদ গাঙ্গুলী (প্রধান শিক্ষক), গৌতম রায় নন্দী, শ্যামল দত্ত, প্রদীপ দাস, পেছনের সারি (বাঁ দিক থেকে) সমীর কুমার দে, মিহিরকান্তি দত্ত, কাশীনাথ বিশ্বাস, অরিজিৎ বসু, দীপক পাইন, দিলীপ ব্রহ্ম, দেবতোষ দে

১৯৬১-১৯৭৮, এই আঠার বছরের মধ্যে তিনটি বৎসর বিবিধ কারণে সুব্রত কাপের খেলা বাতিল ঘোষণা করতে হয়েছে। তবে প্রতিযোগিতার প্রথম বর্ষেই কলকাতার রানী রাসমনি হাইস্কুল জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গকে সম্মানিত করেছিল। বাতিল বছরগুলি বাদ দিয়ে মোট ১৫ বছরের প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে—৭ বার; রানার্স আপ—২ বার। অতএব এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা ও কৃতিত্ব মোটামুটি সন্তোষজনক।

কিন্তু উল্লিখিত খতিয়ানটি বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতাটি আজো তেমন ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। কয়েকটি স্কুলের ধারাবাহিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেই প্রতিযোগিতাটি সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। ১৯৭৮ এবং ১৯৭৯ এই দুটি বৎসরেই প্রতিযোগী স্কুলের সংখ্যা একই রকম (একশোর বেশি) উল্লেখ করে বিভাগীয় দপ্তর থেকে পরোক্ষে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ রাজ্যে আট হাজারের উপরে যেখানে স্কুলের সংখ্যা সেখানে প্রতিযোগী স্কুলের সংখ্যা যে শোচনীয়ভাবে কেন কম, স্কুলকেন্দ্রিক এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রায় দু দশকেও কেন ব্যাপক অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে অধিক সংখ্যক ক্রীড়া প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না—বিভাগীয় দপ্তর সে প্রসঙ্গে আশ্চর্যভাবে নীরব।

কলকাতা সহ রাজ্যের মোট ষোলটি জেলাকে সাধারণত চারটি জোনে বিভক্ত করে ডঃ বি সি রায় শিল্ড ও কে পি মুখার্জি কাপ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মহকুমা বা জেলা পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্ট মহকুমা বা জেলা স্কুলগুলি কি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অংশগ্রহণ করছে? আমাদের খবর, করছে না। শুধু তাই নয়, মহকুমা থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত একশোরও বেশি স্কুল এ বছরেও অংশ নিয়েছে বলে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—সে তথ্য কতদূর সঠিক কারণ জেলা থেকে এমন কি একটি মাত্র দলও সরাসরি জোন পর্যায়ে খেলতে এসেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

বর্তমান বছরেও চারটি জোন। ১ নম্বর জোনে—কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমদিনাজপুর। ২ নম্বরে—মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা। ৩ নম্বরে—কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান এবং ৪ নম্বর জোন—মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

১ নম্বর জোন থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে কালিম্পঙের স্কটিশ ইউনিভার্সিটি মিশন ইনস্টিটিউশন (জেলা দার্জিলিং) সেমি-ফাইনালে ২ নম্বর জোনাল চ্যাম্পিয়ন মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলের (জেলা ২৪ পরগণা) কাছে ২-৩ গোলে পরাজয় বরণ করে। অপর সেমিফাই-নালে ৩ নম্বর জোন থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে

শ্রীগোপাল বিদ্যামন্দির (জেলা কলকাতা) ৪ নম্বর জোনের চ্যাম্পিয়ন ঝালদা হাইস্কুলকে (জেলা পুরুলিয়া) ৭-০ গোলে হারিয়ে দেয়। ফাইনালে মধ্যমগ্রাম শ্রীগোপাল বিদ্যামন্দিরকে হারায় ২-০ গোলের ব্যবধানে। ৭—৯ সেপ্টেম্বর কোচবিহারের এম জে এম স্টেডিয়ামে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে এই প্রথম সুব্রত কাপের নির্বাচনী খেলা উপলক্ষ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

১৯৭৭ ও ১৯৭৮, পর পর দু'বছরেই মধ্যমগ্রাম স্কুল দল রানার্স হওয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কারণ রীতি অনুসারে, সুব্রত কাপের বিজয়ী দল পরবর্তী বছরে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নির্বাচনমূলক খেলায় (পশ্চিমবঙ্গে ডঃ বি সি রায় শিল্ড, কে পি মুখার্জি কাপ) আদৌ অংশগ্রহণ না করে সরাসরি মূল প্রতিযোগিতায় অর্থাৎ দিল্লির সুব্রত কাপে খেলবার অধিকার অর্জন করে।

বর্তমান বছরে রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দল হিসেবে মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলের দলনেতা দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন – 'এবারে আমরা জিতবই।'

এক নজরে ফল

সাল	স্কুল	ডঃ বি সি রায় শিল্ড ও কে পি মুখার্জি কাপ	দিল্লিতে সুব্রত মুখার্জি কাপ
১৯৬১	১) রানী রাসমনি হাইস্কুল, কলকাতা	বিজয়ী	বিজয়ী
	২) আলিপুরদুয়ার হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি	বিজিত	
১৯৬২	১) গোরাবাজার আই সি ইনস্টিটিউশন, মুর্শিদাবাদ	বিজয়ী	বাতিল
	২) রাসপুর হাইস্কুল, হাওড়া	বিজিত	
১৯৬৩	১) বাটানগর হাইস্কুল, ২৪ পরগণা	বিজয়ী	বিজয়ী
	২) কুমুদিনী হোমস, কালিম্পঙ, দার্জিলিং	বিজিত	
১৯৬৪	১) বড়জাগুলিয়া গোপাল একাডেমী, নদীয়া	বিজয়ী	
	২) কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল, মুর্শিদাবাদ	বিজিত	
১৯৬৫	বাতিল		বাতিল
১৯৬৬	১) সিউড়ি রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, বীরভূম	বিজয়ী	
	২) সাতগাছিয়া হাইস্কুল, বর্ধমান	বিজিত	
১৯৬৭	১) স্কটিশ ইউনিভার্সিটি মিশন ইনস্টিটিউশন, কালিম্পঙ	বিজয়ী	
	২) কুলটি বয়েজ হাইস্কুল, বর্ধমান	বিজিত	
১৯৬৮	১) পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন, কলকাতা	বিজয়ী	বিজয়ী
	২) ডন বসকো হাইস্কুল, নদীয়া		
১৯৬৯	১) হাওড়া অক্ষয় শিক্ষায়তন, হাওড়া		
	২) সেণ্ট জোসেপ হাইস্কুল, আলিপুর দুয়ার, জলপাইগুড়ি		
১৯৭০	১) আগরপাড়া নেতাজী শিক্ষায়তন, ২৪ পরগণা	বিং.	
	২) হাওড়া অক্ষয় শিক্ষায়তন, হাওড়া	বিজিত	
১৯৭১	১) পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন, কলকাতা	বিজয়ী	বাতিল
	২) মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল, ২৪ পরগণা	বিজিত	
১৯৭২	১) পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন, কলকাতা	বিজয়ী	বিজয়ী
	২) দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট 'বি' জোন স্কুল, বর্ধমান	বিজিত	
১৯৭৩	১) ইছাপুর নর্থল্যাণ্ড হাইস্কুল, ২৪ পরগণা	বিজয়ী	বিজয়ী
	২) সেণ্ট অগাসটিন, দার্জিলিং	বিজিত	
১৯৭৪	১) পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন, কলকাতা	বিজয়ী	বিজয়ী
	২) গয়েশপুর নেতাজী বিদ্যামন্দির, নদীয়া	বিজিত	

→

"নাম-মাহাত্ম্য"

জয়দেব মুখোপাধ্যায়



কাঠবিড়ালীর ক্ষিপ্রগতি
সাব্বির আলি কি!
দেশের ছেলে বিদেশ হলে
কেই বা এ দেশী?
শেমুই, সুজি নয় জেভিয়ার
পায়েস বাবাজী।
হরজিন্দর বললো, 'ফিলিপ
একটু খাবা-জী'?
মিডফিল্ডে ইন্দ্র খেলেন
তামলরাজও তাই
নাইজিরিয়া, ইরান থেকে
গোলটি দিয়ে যাই।
লামা হ'লেন পুরুত মশাই
উরগেনও কি তাই,
উইলিয়ামের মন কে তবে
সঠিক জানা চাই।

গোলি

সুধীন্দ্র সরকার



লীগ-ম্যাচেতে গোল হল যেই
গোলির গায়ে ইঁট মারে,
কিন্তু যারা ব্যাক-ফরোয়ার্ড
পায়ের ফাঁকে বল ছাড়ে—
তার বেলা, তার বেলা, তার বেলা?
গোলির দোষেই গোল হয়েছে
বললে সবাই 'ধিক্',
কিন্তু আবার গোল বাঁচালেই
নাচবে চতুর্দিক—
হায় খেলা, হায় খেলা, হায় খেলা!



প্রেমজিৎ লাল
বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় এবং
প্রাক্তন ডেভিস কাপ তারকা
№10
ফিল্টার
এঁর লেখা বই "ডাউন দ্য লাইন" ভারতীয় টেনিসের এক জীবন্ত ছবি তুলে ধরে।
"জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এই ভারতেই আছে। তাদের খুঁজে বার করা, তালিম দেওয়া এবং বিশ্ব টেনিস মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করাই আমার সাধনা।"
এঁর সিগারেট : নাম্বার টেন ফিল্টার।
আপোসহীন মান • অসীম তৃপ্তি
নাম্বার টেন
ফিল্টার
যে স্বাদ দিন রাত
মন ভরায়
№10
FILTER
STATUTORY WARNING
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
পশ্চিম বাংলায়
ফিল্টার সিগারেটের
মধ্যে এর বিক্রি
সবচেয়ে বেশি।
Grant 704 Ben
সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর
STATUTORY WARNING.
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

১৯৭৫	১) নন্দপ্রসাদ হাইস্কুল, নকশালবাড়ি, দার্জিলিং	বিজয়ী	
	২) আগরপাড়া নেতাজী শিক্ষায়তন, ২৪ পরগণা	বিজিত	
১৯৭৬	১) আগরপাড়া নেতাজী শিক্ষায়তন, ২৪ পরগণা	বিজয়ী	বিজয়ী
	২) পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন, কলকাতা	বিজিত	
১৯৭৭	১) পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন, কলকাতা		
	২) মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল, ২৪ পরগণা (বিজয়ী বলে ঘোষিত)		
১৯৭৮	১) মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল, ২৪ পরগণা	বিজয়ী	
	২) পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন, কলকাতা	বিজিত	
১৯৭৯	১) মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল, ২৪ পরগণা	বিজয়ী	আসন্ন
	২) শ্রীগোপাল বিদ্যামন্দির, কলকাতা	বিজিত	



১৪ বছর বয়সের ভল্টে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান রীনা প্রামানিক

হুগলিতে শুধু মেয়েদের জিমন্যাস্টিক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ শুধু মেয়েদের নিয়ে হুগলি জেলায় এক জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। সিঙ্গুর ডি ভি সি ময়দানে ওই প্রতিযোগিতায় ৬০ জন মেয়ে অংশ নেয়। ওদের বয়স ছিল চোদ্দ থেকে কুড়ি। তার মধ্যে রীনা প্রামানিক, বিবিতা কোলে ও ছবি দত্ত বিভিন্ন বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। দলগত চ্যাম্পিয়ন হয় তেলিনীপাড়ার উদয়ন ব্যায়াম সমিতি এবং দ্বিতীয় সিঙ্গুর বাণী সংঘ।

প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল উত্তরপাড়া জিমন্যাসিয়াম, উদয়ন ব্যায়াম সমিতি, বাণী সংঘ, স্মৃতি মন্দির, মিলন ব্যায়াম সমিতি ও সুইমিং ইনস্টিটিউটের মেয়েরা। সিঙ্গুর বাণী সংঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যেই হুগলি জেলা জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় এই প্রতিযোগিতা হয়।

চোদ্দ বছর বয়সের মেয়েদের বিভাগে ভল্টিং হর্স ও ফ্লোর দুটোতেই প্রথম হয় রীনা প্রামানিক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে জ্যোৎস্না দাস ও সংযুক্তা চ্যাটার্জি। আঠারো বছর বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন ববিতা কোলে ভল্টিং হর্স ও আনইভন বারে প্রথম স্থান পায়। কিন্তু ফ্লোর এবং বিম ব্যালান্সে হয়ে যায় দ্বিতীয়। কিন্তু ওই পায় সর্বোচ্চ সংখ্যক পয়েন্ট!

কুড়ি বছর বয়স বিভাগে স্মৃতি মন্দিরের ছবি দত্ত অসাধারণ সাফল্য দেখায়। ফ্লোর ভল্টিং হর্স ও বিম ব্যালান্স প্রত্যেকটিতেই প্রথম হয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হতে ওকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। ●

ফুটবল ও হাওড়া জেলা

গোপাল মুখার্জি ঃ বাংলার ফুটবলের গত একশো বছরে যে কয়েকটি জেলার অবদান রয়েছে হাওড়া জেলা তার মধ্যে অন্যতম একথা হলপ করে বলা চলে।

এই জেলা থেকে ল্যাংচা মিত্র, শৈলেন মান্না, রাজেন মিত্র, কে প্রসাদ, বদু ব্যানার্জি, অরুণ ঘোষ, নীলেশ সরকার প্রমুখকে পাওয়া গেছে। ১৮৯৩ সালে আই এফ এ শিল্ডের প্রথম বছরে হাওড়া ইউনাইটেড ফাইনালিস্ট। অবশ্য ওয়েস্টার্ন ডিভিসন রয়েল আর্টিলারী শেষ পর্যন্ত শিল্ড জিতে নেয় ১-০ গোলে হাওড়া ইউনাইটেডকে হারিয়ে।

১৮৬৮ সালে প্রধানত রবার্ট ভান্সিটার্টের উদ্যোগে কলকাতা ফুটবল লিগ চালু হয় এবং ন'বছর পর তার প্রভাবেই এই জেলায় ফুটবলের প্রসার ঘটে। প্রথমাবস্থায় রেলওয়ে পুলিশ ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের মধ্যেই খেলা সীমাবদ্ধ ছিল। পরে বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে।

কলকাতা ফুটবল লিগে প্রথম বাঙালী খেলোয়াড় শরৎ চৌধুরী এই জেলার গর্বের। তদানীন্তন ইউরোপীয় দল হাওড়া ইউনাইটেডে শরৎবাবু প্রথম খেলার সুযোগ পান। সেখানেও তিনি ছিলেন একমাত্র ভারতীয়। রয়াল আইরিশ রাইফেলের বিরুদ্ধে তার চমকপ্রদ খেলা কিংবদন্তীর কথা।

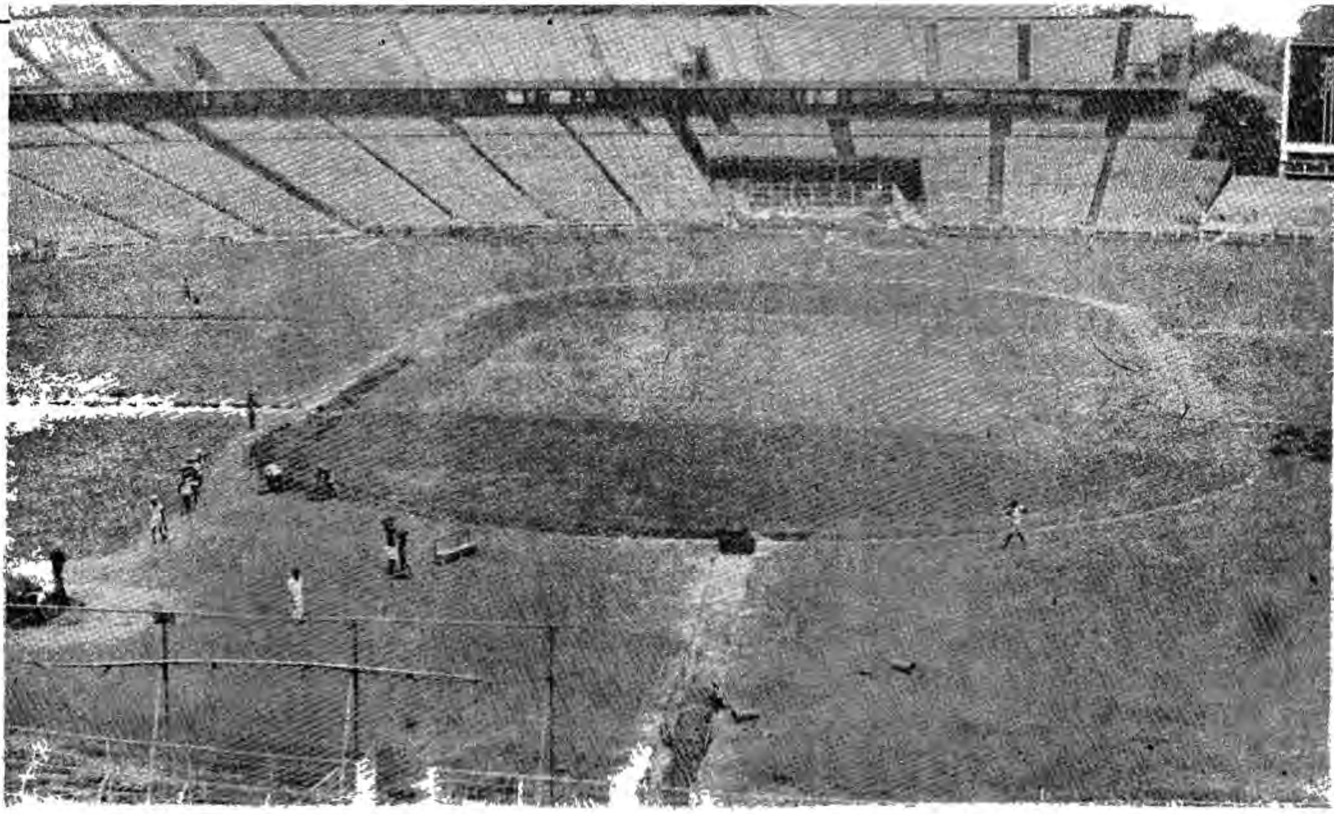
১৮৯০ সালে জেলার প্রথম ক্লাব হিসেবে হাওড়া ইউনাইটেডের আবির্ভাব, ১৮৯৩-এ আই এফ এ শীল্ডে সাফল্য। ১৮৯৬-এ শিবপুর বি ই কলেজ ট্রেডস কাপ জেতে।

১৯১৮ সালে হাওড়া টাউন ক্লাবের পত্তন জেলার ফুটবলে এক গুণগত পরিবর্তন আনে। রাজা বিধানসভার প্রাক্তন স্পীকার প্রয়াত বঙ্কিম কর ও প্রয়াত রায়সাহেব সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় এই ক্লাব স্থাপনে প্রধান উদ্যোক্তা।

হাওড়া টাউন ক্লাবের উদ্যোগেই এই জেলায় প্রথম লিগ ফুটবল শুরু হয়। এখন যার নাম হাওড়া জেলা লিগ। দীর্ঘ ষাট বছরের এই ক্লাব এবছরই (১৯৭৯) তৃতীয় ডিভিসনে খেলেছে। গত বছর এরা চতুর্থ ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন। শৈলেন মান্নার ফুটবল শুরু এখানেই। এই জেলা থেকে কলকাতা প্রথম ডিভিসনে এখন মাত্র ২টি দল আছে, হাওড়া ইউনিয়ন ও সালকিয়া ফ্রেণ্ডস। অবশ্য বালী প্রতিভা ও ইন্টারন্যাশনাল বেশ কয়েকবছর প্রথম ডিভিসনে খেলেছে।

১৮৪৩ সালে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার অংশবিশেষ নিয়ে সৃষ্ট হাওড়া জেলা দেশের রাজনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি থেকে খেলাধুলো পর্যন্ত সর্বত্রই গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে এসেছে। ●


খেলাধুলার
প্রতিযোগিতায়
জেতার পর
তৃষ্ণা যখন বক্ষ জুড়ে
লিম্‌কায় তখন মনটি ভরে!
Limca
RADEUS/PE/L-16
লিম্‌কা
লেবুর সরবতের মত মজাদার পানীয়



ময়দানের কড়চা

কলকাতা মাতিয়ে দিয়ে গেল দুর্গোৎসব। বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে জেরবার শহর। এ সময়ে মনে প্রাণে কেউ বৃষ্টি চায়নি। বৃষ্টি চায়নি কলকাতা ময়দানও এই ময়দান এলাকায় ইতিমধ্যে ক্রিকেটের পরশ লেগেছে। মাঠের পাশে জড় হচ্ছে গাড়ি গাড়ি এ'টেল মাটি। কর্মীরা সেই মাটি বিরাট বিরাট ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ক্রিকেট-পিচ তৈরি করবে। অনেক মাঠে ইতিমধ্যে মাটি ফেলা হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি! বৃষ্টি সব মাটিকে কাদা করে ফেলেছে।

কাদায় কাদাময় ইডেনও পুজোর শুরুতে পঙ্কজ গুপ্ত গেট দিয়ে ঢুকেই শুনলাম পি ডবলিউ ডি-র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিমান বসু কর্মীদের উদ্দেশে বলছেন—এখন ছুটির নাম করবে না কেউ। পুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো কোন ছুটি নয়।

শক্ত সমর্থ চেহারা, প্রায় যুবক সদৃশ অভিজ্ঞ বিমানবাবুর চিন্তা কি করে ২৬ অক্টোবরের আগে সাজান ইডেন তুলে দেবেন সি এ বি-র হাতে। রাতদিন কাজ হচ্ছে, বিমানবাবু ঘুরে ঘুরে তদারকি করছেন। বিমানবাবুর প্রধান দায়িত্ব ইডেনের পিচ, মাঠ, মাঠ থেকে জল বের করে দেবার ড্রেনের ব্যবস্থা প্রভৃতি। অন্যদিকে নিয়ত কাজ চলছে ইডেনের দিকে গ্যালারি তৈরি, এতদিন যে সমস্ত গ্যালারি ছিল কাঠের তাকে কংক্রিট গ্যালারি করা এবং সংশ্লিষ্ট কাজ। এবারে আনকোরা প্রায় সাড়ে চার হাজার সিট বাড়ছে এবং এই সমস্ত কাজের জন্য রাতদিন কাজ করে চলেছে হাজার খানেক মানুষ। মাঠের কাজে রয়েছে আরও শ'খানেক মানুষ এবং নকুলের অধীনে বেশ কিছু মালী।

মাঠের ড্রেনের ব্যবস্থা সারা। উপরে মাটি চাপা দিয়ে তার উপরে ঘাস লাগান হচ্ছে। ঘাসে জল ছিটিয়ে তার পরিচর্চাও হচ্ছে। ঠিক মাঝখানটায় পিচের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটি কিন্তু আনডিসটার্ব। নকুলের সঙ্গে দেখা ওই পিচের কাছে, খুঁটে খুঁটে খোয়া-ইঁটের টুকরো, বিজাতীয় ঘাস তুলছে। পাশ দিয়ে ঝুড়ি ভর্তি করে খোয়া, পাথরকুচি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মজুররা। 'মাথা-বদলের' সময় দু'চারটে টুকরো ছিটকে যাচ্ছে। নকুল সদা-সতর্ক, সঙ্গে সঙ্গে তা হাতে তুলে নিচ্ছে।

'কি গো নকুলভাই, পিচের খবর কি?'

'পিচ তো ভাল হবে বাবু। তবে এখন টেস্টের জন্য পিচ। তবে এতো বৃষ্টি, শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখুন।' নকুলের উত্তর।

পিচ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিমানবাবু বললেন—'খেলার আগে আসল টেস্ট পিচ ও দু'প্রস্থ অনুশীলন পিচ অবশ্যই তৈরি হয়ে যাবে। লক্ষ্য করে দেখুন সারা মাঠে কাজ চললেও পিচ 'আনটাচড্', ওর কাজ শুরু হয়েছে আগেই। ও জায়গাটা আমরা খোঁড়া-খুঁড়িও করিনি। পিচের জন্য ভাবিনা। তবে সন্দেহ হয় ড্রেনের জন্য খোঁড়াখুঁড়ির পর আউট ফিল্ডের অবস্থা হয়ত যা চাইছি তা হবে না।'

'পিচ এবার কেমন হবে? অস্ট্রেলিয়া দলের অভিযোগ আমাদের পিচ আদৌ ফাস্ট বোলারদের অনুকূলে নয়। ইডেনের পিচও কি সেই অভিযোগে অভিযুক্ত হবে?'

'দেখুন পিচের চরিত্র কিভাবে গড়তে চাইছি তা বলব না। তবে যা অবস্থা তাতে আমরা যা করতে চাইছি তা নাও পেতে পারি। তবে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার সময় যে পিচ হবে তা আমাদের ইচ্ছানুযায়ীই হবে।' বিমানবাবু একথা বলে বললেন—'বড় সময় কম। জানিনা এ সময়ে বৃষ্টির হাত থেকে ম্যাচ বাঁচবে কিনা। তবে সেটা তো প্রকৃতির ব্যাপার। আমরা আমাদের চেষ্টা করে যাব।'

মাঠ ভর্তি ও গ্যালারিতে অজস্র অসমাপ্ত কাজ। কৌতুক করেই বললাম—'এত কাজ শেষ করবেন কবে? শেষ পর্যন্ত শেষ হবে তো।'

দর্শকাসনের একেবারে পায়ের কাছে, রেলিং ঘেঁসে তৈরি হচ্ছে বৃত্তাকার ড্রেনটি, যাকে ঢেকে রাখা হবে কংক্রিটের তৈরি নেটের ঢাকনা দিয়ে। সেইখানে দাঁড়িয়ে কর্মীদের কাজ দেখতে একবার মুখ তুলে চেয়ে মৃদু হেসে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বিমানবাবু বললেন—'আসুন না দিন দশেক পরে। আপনার প্রশ্নের উত্তর হয়তো তখনই অনেকটা পেয়ে যাবেন।'

প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট-অধিনায়ক নটবর সিংজী

সুব্রত সরকার ঃ ভারতে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পর ১৯৩২-এ পোরবন্দরের মহারাজার নেতৃত্বে একটি দল ইংল্যাণ্ড সফরে যায়। সেই দলের অন্যতম সদস্য অলরাউণ্ডার নারিম্যান মার্শাল গত আগস্ট মাসে মারা যান আরেকজন সদস্য উইকেটরক্ষক জনার্দন নাভলে গতমাসে পরলোকগমন করেন। এদের দু'জনের কথা 'খেলার আসর'-এর ২৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লেখা হয়েছিল। সেই লেখা প্রকাশিত হওয়ার দিন কয়েকের মধ্যেই মারা গেলেন ১৯৩২-এর সেই প্রথম ভারতীয় দলের অধিনায়ক, পোরবন্দরের প্রাক্তন মহারাজা নটবর সিংজী।

তখনকার দিনে প্রথা ছিল রাজা-রাজপুত্র ছাড়া সাধারণ কেউ দলনায়ক হবে না। প্রথমে ঠিক হয়েছিল সফরকারী দলের নেতৃত্ব করবেন পাতিয়ালার মহারাজা ভূপিন্দর সিং। ব্যক্তিগত কারণে তিনি সফরে যেতে নারাজ হওয়াতে অধিনায়কত্বের ভার পড়ে পোরবন্দরের মহারাজার উপরে।

নটবর সিংজীর জন্ম ১৯০১-এ। লেখাপড়া করেন রাজকোটের রাজকুমার কলেজে—দলীপ সিংজী একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার থেকে বছর কয়েক জুনিয়র ছিলেন। ১৯২০ সালে পোরবন্দরের মহারাজা হওয়ার পর



নটবর সিংজী মাঝে মধ্যে বোম্বাই আর পুনেতে কাথিয়াওয়ার থেকে ক্রিকেট দল নিয়ে যান। এসব খেলায় তিনি বেশ ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। তবে তাকে কোনমতেই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার বলা চলে না।

১৯৩২-এর প্রথম দিকে দিল্লির রোশনারা ক্লাব মাঠে তিনি ভাইসরয়ের একাদশের বিরুদ্ধে ক্লাব দলের নেতৃত্ব করেন। তার অধিনায়কত্ব ভাল হয়েছিল বলে ইংল্যাণ্ড সফরের জন্য তাকেই ক্যাপ্টেন করে দেওয়া হয়।

তবে নিজের ক্রিকেট খেলার ক্ষমতা সম্বন্ধে নটবর সিংজীর কোন ভুল ধারণা ছিল না। তাই ইংল্যাণ্ড সফরে তিনি মাত্র চারটি ম্যাচে খেলেছিলেন। লর্ডসে একমাত্র টেস্টের সময়ে তিনি আর সহ-অধিনায়ক লিমড়ির মহারাজকুমার ঘনশ্যাম সিংজী দুজনেই সরে দাঁড়াতে দলের নেতৃত্ব করেন সি কে নাইডু।

দেশে ফিরে এসে পোরবন্দরের মহারাজা রাণাসাহেব মাত্র একটিই বড় ম্যাচ খেলেন। এটি দিল্লির উইলিংডন মাঠ (বর্তমান ফিরোজ শাহ কোটলা গ্রাউণ্ড) উদ্বোধনের উপলক্ষে।

মৃত্যুকালে নটবর সিংজীর বয়স হয়েছিল ৭৯। খেলোয়াড় হিসাবে তার তেমন সুনাম ছিল না, ভারতের প্রথম সফরকারী দলের অধিনায়ক বলেই আমাদের ক্রিকেট ইতিহাসে তার স্থান। তবে ১৯৪৭-এর জুন মাসে তিনি পোরবন্দরে ভারতের প্রথম ক্রিকেট স্কুল স্থাপিত করেছিলেন—তার নাম দলীপ স্কুল অফ ক্রিকেট। তার ইচ্ছা ছিল রঞ্জি-দলীপের দেশ থেকে আরও বড় ক্রিকেটার তৈরি হয়। তবে নটবর সিংজীর জীবনকালে অন্তত সেখান থেকে কোন ভাল ক্রিকেটার ওঠেনি অবশ্য গুজরাটের রাজকোট শহরেই ভারতের নতুন স্পিনার দিলীপ দোশি জন্মগ্রহণ করেছিল।

ওলিম্পিকের গপ্পো

লেখা ঃ অশোক চট্টোপাধ্যায় ও রেখা ঃ জি সান্তা



শব্দ জব্দ

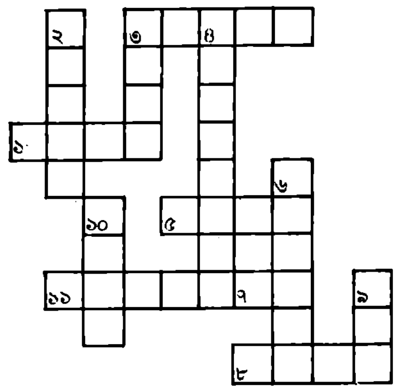
দেবাশিস মণ্ডল,
দশম শ্রেণী,
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল,
পোঃ + জেলা—হুগলী।

পাশাপাশি

১। বিশ্বকাপ ফুটবলের শততম গোলদাতা।
৪। 'ব্ল্যাক ব্র্যাডম্যান' নামে খ্যাত ছিলেন এই ক্রিকেটার।
৫। এখন পর্যন্ত ওলিম্পিক গেমসে সবচেয়ে বেশি সোনার পদক পেয়েছেন এই প্রতিযোগী।
৭। ১৯৫৮ ও ১৯৭০ সালে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জয়ে প্রধান কৃতিত্ব ছিল এই দুরন্ত খেলোয়াড়ের।
৮। টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসে ব্যক্তিগত ভাবে সর্বপ্রথম ত্রিশতাধিক রানের ইনিংস খেলেছিলেন এই ব্যাটসম্যান।
১১। সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি (১০ দিন) ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচের আসর বসেছিল এই শহরে।

উপর-নীচ

২। অতীতের দিকপাল বাঙালী সাঁতারু।
৩। এই খেলোয়াড়টির জন্য গত বিশ্বকাপে স্কটল্যাণ্ড দল প্রভূত বদনাম কুড়িয়েছে।
৪। বিশ্ব টেবল টেনিসের মিক্সড ডাবলসে বিজয়ীদের এই প্রাইজ দেওয়া হয়।
৬। এই ক্রিকেটার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের ১০০টি ইনিংস খেলে একবারও খালি হাতে ফেরেননি।
৯। সম্প্রতি একটি টেস্ট ম্যাচের এক ইনিংসে সেঞ্চুরি ও ৪টি উইকেট পেয়েছেন এই তরুণ অলরাউণ্ডার।
১০। শ্রমসাধ্য ম্যারাথন দৌড়ে সর্বপ্রথম ঘণ্টায় ১৫ মাইলের চেয়েও বেশী স্পিডে দৌড়েছিলেন এই অ্যাথলিট।



২৮ সেপ্টেম্বরের শব্দ-জব্দের সমাধান

পাশাপাশি ঃ	উপর-নীচ ঃ
১। হানিফ	১। হারুন
৩। ভিরেন	২। নরিজা
৫। খাবাজি	৪। সোবার্স
৭। রমেশ	৬। নিসার
৯। সাব্বির	৮। লিভার

এ ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দ জব্দের সঙ্গে পাঠান

নাম ____________

অভিভাবকের নাম ____________

ঠিকানা ____________

বিদ্যালয় ____________

বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর ____________

বিদ্যালয়ের সীলমোহর ____________

ক্রীড়া সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সেবীদের ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব পরিচালিত সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সেবীদের জন্য সরলা বালা সরকার কাপ ও প্রফুল্ল সরকার কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা দুটির ফাইনাল ২২ সেপ্টেম্বর মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে হয়। সরলাবালা সরকার কাপের ফাইনালে ক্রীড়া সাংবাদিকদের নিয়ে গঠিত পেন অ্যাণ্ড ইংক ও ফটোগ্রাফার্স' অ্যাসোসিয়েশনের খেলায় অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত কোন গোল না হওয়ায় উদ্যোক্তারা দু'দলকে যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করেন। প্রথমার্ধে ফটোগ্রাফার্স ও দ্বিতীয়ার্ধে পেন অ্যাণ্ড ইংক গোল করার সুযোগ নষ্ট করে। পেন অ্যাণ্ড ইংকের দুটি গোল অফসাইডের অজুহাতে রেফারি ও লাইন্সম্যানরা নাকচ করার পর মাঠে উপস্থিত দর্শকরা (সাংবাদিক বাদে) কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

প্রফুল্ল সরকার কাপের ফাইনালে তরুণদের নিয়ে গঠিত বসুমতী একাদশ আনন্দবাজারকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে। দুটি প্রতিযোগিতায় অন্য যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন প্রেস ক্লাব, আকাশবাণী, দূরদর্শন ও খেলার আসর।

প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রশান্ত সরকার পুরস্কার বিতরণ করেন। দীপালি কুমার ঘোষ উদ্যোক্তাদের পক্ষে দুটি প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।

কলকাতায় এশিয়ান টেবল টেনিসে বিশ্বের সেরা কয়েকজনকে দেখা যাবে



নিজস্ব প্রতিনিধিঃ আগামী বছর ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চের মধ্যে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে পঞ্চম এশিয়ান টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন বেঙ্গল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। প্রজাতন্ত্র চীন, জাপান, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেবল টেনিস দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে জানিয়েছে। ভারতে এর আগে ১৯৬০ সালে প্রথম এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা হয় বোম্বাইয়ে।

এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার পর ১৯৮০-তে গ্রাঁ প্রি টেবল টেনিসে ইউরোপের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা যোগ দিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতায় ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাদ্বয় প্রবীর মিত্র ও গোপীনাথ ঘোষরা এবার বেঙ্গল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে পঞ্চম এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করছেন। প্রতিযোগিতার বিস্তারিত সংবাদ দিয়ে শ্রীমিত্র ২৬ সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের টেবল টেনিস বোর্ড ও বল নির্মাতারা নানাভাবে সহযোগিতা করতে চাইছেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের পর যে দুটি ইলেকট্রনিক স্কোর বোর্ড সমেত টেবল পাওয়া গিয়েছিল সে দুটি এশিয়ান টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের সময় ব্যবহার করা হবে—শ্রীমিত্র জানান। মোট ব্যয় হবে ২৫ লক্ষ টাকা।

মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিণ্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত

জয় ফুটবল জয়

(পাঁচিশ)

আলেখ্য ঃ ভাল্টার নয়গেবাউয়ার,
অনুবাদ ঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত



Registration No. 30198/77 KHELAR AASAR 5-12 October 1979 WB/CC—334/77 Rs. 1.50

